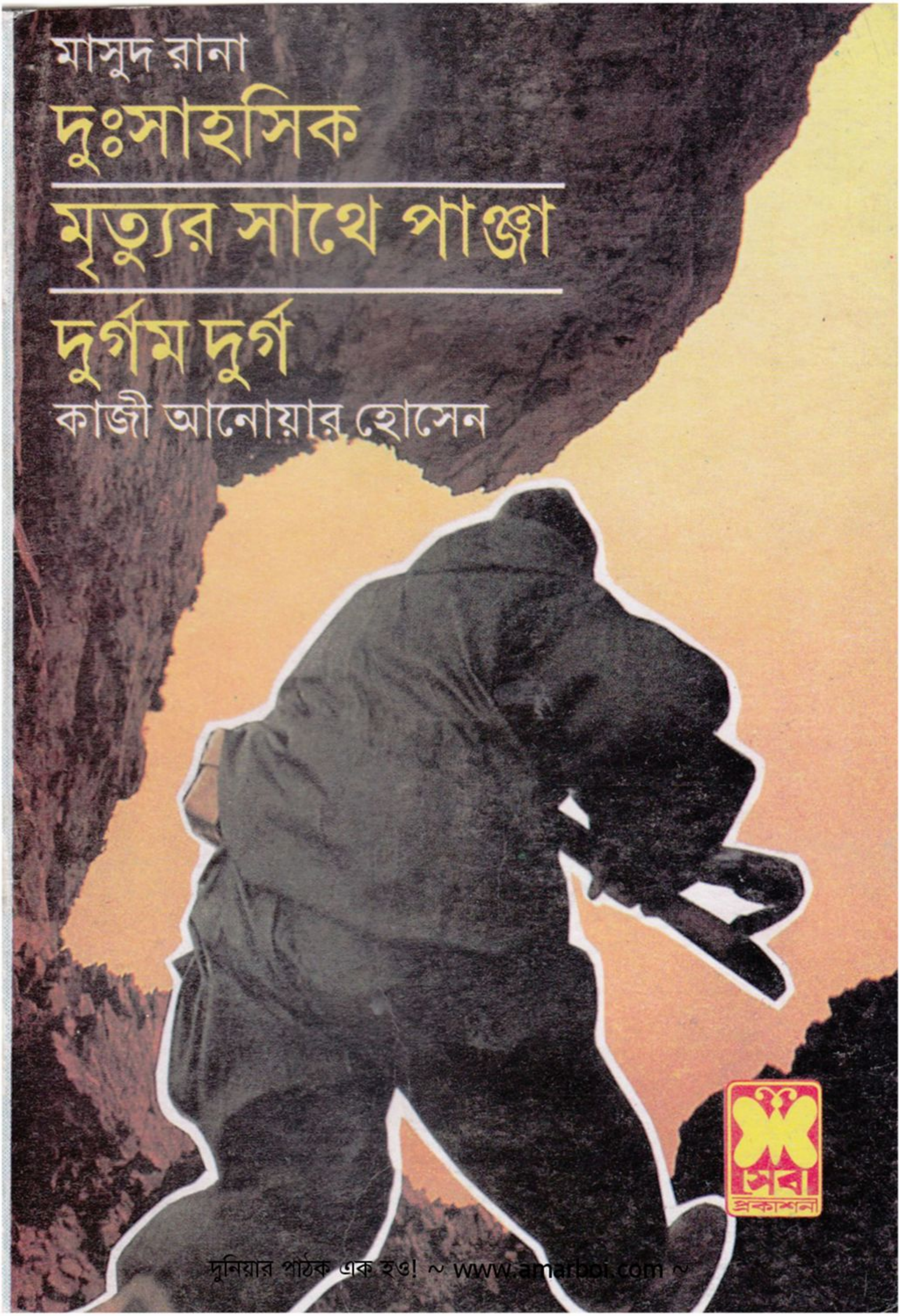
মাসুদ রানা

দুঃসাহসিক

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা

দুর্গম দুর্গ

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

ভলিউম-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সঙ্গে পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত। ধন্যবাদ।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ভলিউম-২

দুঃসাহসিক

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা

দুর্গম দুর্গ

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7004-6

দুঃসাহসিক

প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৭

এক

সুপারসোনিক জেট পনেরো মিনিটের জন্যে নামল ক্যান্টনে। রি-ফুয়েলিং দরকার। রানার রিস্টওয়াচে তখন বাজে বাংলাদেশ সময় দুপুর আড়াইটা। সাংহাই পৌছতে পৌছতে বেজে যাবে সোয়া চারটে। ওখানকার সময় অবশ্য সোয়া ছয়। সাংহাই নগরীতে সন্ধ্যা নামবে তখন। রানা ভাবল, একটা সোনালী বিকেল বাদ পড়ল ওর জীবন থেকে, দু'ঘন্টা আয়ু কমে গেল ওর—আবার পূরণ হবে কিনা কে জানে।

আজই সকালে বেইজিং থেকে কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে পি.সি.আই. চীফকে। ছবি এসেছে রেডিও মারফত। ছবি দেখে চমকে উঠেছেন রাহাত খান। রোববার ছুটির দিনেও অফিসে ডেকে পাঠিয়েছেন মাসুদ রানাকে সিনক্রাফোনের সাহায্যে। ক্যান্টন থেকে সুপারসোনিক জেট অবশ্য এসে পৌচেছে আরও পরে—বেলা সাড়ে এগারোটায়।

ছবি দেখে রানাও কম অবাক হয়নি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে ছবিটা। ঘন কালো চুল, ক্লিন শেভ করা বাঙালী চেহারা। দেখতে ভালই। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। চাহনিতে একটা নিষ্পাপ সারল্য। কেবল এইখানেই একটু তফাৎ, তাছাড়া অবিকল রানারই প্রতিচ্ছবি।

ছবি থেকে চোখ তুলেই রানা দেখল পুরু কাঁচ ঢাকা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশ থেকে ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ নীরবে লক্ষ করছে ওর মুখ। মুখ খুললেন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য কর্ণধার মেজর জেনারেল রাহাত খান।

'ছবিটা এসেছে বেইজিং থেকে। সেই সাথে এসেছে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের হেড অ্যাডমিরাল হো ইন-এর কাছ থেকে সাহায্যের অনুরোধ। মোটামুটি এই রকম দেখতে আমাদের ইন্টেলিজেন্সের একজন দুঃসাহসী বাঙালী লোক চাই ওদের গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক কোনও কাজের জন্যে। ছবিটা তোমার চেহারার সাথে অনেকটা মিলে যাচ্ছে।'

'তাই তো দেখছি, স্যার,' বলল রানা। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তা কাজটা কি? কি ধরনের সাহায্য চাইছে, স্যার?'

'সে-কথা জানায়নি। কিন্তু ওদের ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার হবে। আধঘন্টা আগেই ক্যান্টন থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে ওদের একখানা সুপারসোনিক জেট। আমাদের উত্তর পৌছতে যেটুকু দেরি

হবে সেটুকু সময়ও ওরা নষ্ট করতে চায় না। যদি এই চেহারার লোক পাওয়া না যায় তাহলে ফিরে যাবে জেট —কিন্তু যদি পাওয়া যায়, তাহলে যে সময়টুকু বাঁচল, বোঝা যাচ্ছে, সেটুকুর দাম ওদের কাছে অনেক। শুধু শুধু এত তাড়াহুড়ো করবার লোক নন অ্যাডমিরাল হো ইন্। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার আছে এর পেছনে।'

রানার মাথার ওপর দিয়ে পেছন দিকে দেয়াল ঘড়িটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন রাহাত খান।

'চীন আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। অসময়ের বন্ধু। শুধু মুখেই নয়, কাজেও। বহুবার আমাদের বিপদে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের সিক্রেট সার্ভিস—বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত। আমরাও যথাসাধ্য সাহায্য করেছি ওদের। কয়েকবার উদ্ধার করে দিয়েছি ওদের এজেন্টদের শত্রু রাষ্ট্রে ধরা পড়বার মুখে। কিন্তু এই প্রথম ওরা সরাসরি সাহায্য চাইল আমাদের কাছে। নিশ্চয়ই মস্ত ঠেকা ঠেকেছে কোথাও। এই অবস্থায় লোক থাকতেও যদি আমরা ফিরিয়ে দিই ওদের, তাহলে আমাদের মুখ থাকে না। আর যদি এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করি তাহলে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়। আমাদের দ্বারা চীন যদি উপকৃত হয় তাহলে আমরাও অসঙ্কোচে একটা জিনিস চাইতে পারব ওদের কাছে। ওরা দেবেও।'

'কি জিনিস?'

'ওদের তৈরি হাইলি ডেভেলপড্ ক্রিপটোগ্রাফির মেশিন। চীনারা এ ব্যাপারে গ্র্যাণ্ডমাস্টার হয়ে গেছে। আইবিএম-এর চাইতে হাজার গুণে ভাল এই মেশিন তৈরি করে বছরখানেক ধরে পৃথিবীর সমস্ত ওয়্যারলেস ট্রাফিক ক্র্যাক করে ডিকোড করছে ওরা। সমস্ত চ্যানেল—ন্যাভাল, এয়ার ফোর্স, ডিপ্লোমেটিক, সবকিছুর আঁটি ভেঙে শাঁস খাচ্ছে ওরা। মাঝে মাঝে ছিটেফোঁটা প্রসাদ আমরা পাই অবশ্য, কিন্তু তাতে চলে না। ওই মেশিনটা আমাদের চাই-ই চাই। কিন্তু সবই এখন নির্ভর করছে তোমার রাজি হওয়া না-হওয়ার ওপর। ভাল করে ভেবে-চিন্তে উত্তর দাও। যাবে?'

রাহাত খানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রানার মুখের ওপর এসে স্থির হলো। কান দুটোতে একটু উত্তাপ অনুভব করল রানা। অস্বস্তি বোধ করল কেমন যেন।

'আপনি কি বলেন, স্যার?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'আমি কিছুই বলব না। তুমি জানো, কোনও বন্ধু-ভাবাপন্ন দেশ সাহায্য চাইলে সাহায্য করাটাই ভদ্রতা। তার ওপর ওদের কাছে আমরা অনেক ব্যাপারে ঋণীও আছি। যদিও আগামী একমাসের মধ্যে তোমার জন্যে কোনও অ্যাসাইনমেন্ট নেই, তবু নিছক ভদ্রতা করতে গিয়ে আমি তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। চাইও না। তাছাড়া অন্য একটা দেশকে সাহায্য করতে তুমি বাধ্য নও। তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে সেটা। ইচ্ছে করলে এড়িয়েও যেতে পারো।'

'তাতে আমাদের দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরবে না?'

'না। সাহায্যের অনুরোধ ভদ্রভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অনেক কৌশল আছে। তাছাড়া কোনও রকম অবলিগেশনের মধ্যেও আমরা নেই যে সাহায্য

করতেই হবে। এটা সম্পূর্ণ গুড-উইলের ব্যাপার। তবে···' মাথাটা একটু কাত করে তর্জনী দিয়ে চোখের নিচটা একটু চুলকে নিলেন রাহাত খান। 'এটাও ঠিক, মেশিনটা পেলে আমাদের বড় উপকার হয়।'

রানা বুঝল মনে মনে রাহাত খান চাইছেন যেন রানা রাজি হয়ে যায় —কিন্তু কি কাজ, কতখানি বিপদ, ইত্যাদি ভাল মত না জেনে অনুরোধ করতে ভরসা পাচ্ছেন না। পাছে কি হতে কি হয়ে যায়—চিরকাল পস্তাতে হতে পারে। কিন্তু টিটাগড়ের অপারেশন গুড-উইলে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের কাছে রানা ব্যক্তিগতভাবে ঋণী হয়ে আছে। ওরা ঠিক সময় মত সাহায্য না করলে জয়দ্রথ মৈত্রের হাত থেকে বাঁচবার কোনও উপায়ই ছিল না ওর। তাই মন স্থির করে নিল সে। দেশে যখন কাজ নেই কোনও, বিদেশও ঘুরে আসা যাবে এই সুযোগে।

'আমি রাজি আছি, স্যার। ওদের জেট পৌঁছবে ক'টায়?'

একটা কালো মেঘ যেন সরে গেল রাহাত খানের মুখের ওপর থেকে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ দুটো। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

'সাড়ে এগারোটা। তুমি তাহলে এক্ষুণি রেডি হয়ে নাও, রানা। আমি পিকিংকে জানিয়ে দিচ্ছি। যাও, কুইক।'

সাংহাই এয়ারপোর্টের প্রোটেক্টেড এরিয়াতে রানওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানা কালো ক্যাডিলাক। রানা সিঁড়ি বেয়ে নামতেই সহাস্যে এগিয়ে এল মধ্যবয়সী একজন চীনা ভদ্রলোক। পরনে দামী সার্জের স্যুট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, কালো অক্সফোর্ড-শূ পায়ে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, 'আমি অ্যাডমিরাল হো ইন্। প্লীজড্ টু মিট ইয়ু, মিস্টার মাসুদ রানা।'

তাজ্জব বনে গেল রানা। ইনিই অ্যাডমিরাল হো ইন! চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ! প্রত্যাভিবাদন করতেও ভুলে গেল সে। বলে ফেলল, 'আপনি না বেইজিং ছিলেন আজ সকালে?'

'হ্যাঁ।' মৃদু হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'কেবল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্যেই আমি বার্তা পাওয়া-মাত্রই এই আটশো মাইল চলে এসেছি। আপনি এসেছেন এক মহান দেশ থেকে। আপনি আমাদের সম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় বলে আপনাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাতে পারছি না আমরা। সেজন্যে আমি নিজে এসেছি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে।'

রানার জানা আছে, জাপানী আর চীনারা বিনয়ের অবতার। সত্যি সত্যিই কি কেবল তার সম্মানের জন্যেই এতবড় একজন লোকের পক্ষে আটশো মাইল ছুটে আসা সম্ভব? মনে হয় না, আবার হতেও পারে। পাকিস্তান সম্পর্কে যে উঁচু ধারণা পোষণ করে ওরা, তাতে এই ঘটনা একেবারে অসম্ভব না-ও হতে পারে। যাই হোক, অ্যাডমিরাল যে ওই ছবির ব্যাপারেই এতদূর এসেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বুঝল রানা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনার সাথে জড়িয়েছে সে নিজেকে। মহারথীদের নিয়ে কারবার। সামনে কি অপেক্ষা করছে কে জানে!

'চলুন, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার জন্যে সাংহাইয়ের সেরা হোটেলের

সুইট রিজার্ভ করা হয়েছে। সেখানেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন আমাদের সার্ভিসের সাংহাই-চীফ কর্নেল লু সান। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। গাড়িতেই যতখানি সম্ভব অবস্থাটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব, বাকিটা হোটেলে পৌঁছে জানতে পারবেন।'

গোধূলির শেষ রঙ মুছে যাচ্ছে সাংহাইয়ের আকাশ থেকে। একটা দুটো করে জ্বলে উঠছে তারার প্রদীপ। বিস্তীর্ণ অ্যারোড্রোমের সিমেন্ট করা রানওয়েটা আবছা হয়ে আসছে। উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে দূরে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংটায়। একটা প্যাসেঞ্জার প্লেন নামছে দূরে ছবির মতন।

ক্যাডিলাকের পেছনের সীটে উঠে বসল রানা এবং অ্যাডমিরাল। রানার এয়ার ব্যাগ এবং অ্যাটাচি কেস্টা ড্রাইভারের পাশে সীটে রাখা হলো। ছুটে চলল ওরা শহরের দিকে দুটো চেক পোস্টে আধ মিনিট করে দাঁড়িয়ে।

'আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেশ অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছি, জানেন বোধহয়। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছি, এখন মহাশূন্যে রকেট পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আমাদের এই দ্রুত অগ্রগতি অনেকের কাছে চক্ষুশূলের মত ঠেকে। আমাদের সমূলে ধ্বংস করতে সদা সচেষ্ট হয়ে আছে বহির্বিশ্বের কয়েকটি বৃহৎ শক্তি; তাই এটাকেই আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছি আমরা। এছাড়া আমাদের টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। যাক, এই নিউক্লিয়ার গবেষণায় একটা ধাতু অপরিহার্য। জানেন সেটা কি?'

'ইউরেনিয়াম।'

'ঠিক। বাইরে থেকে আমরা এই ইউরেনিয়াম জোগাড় করতে পারিনি। কেউ দেয়নি আমাদের ইউরেনিয়াম। তাই বহু খোঁজাখুঁজির পর অক্লান্ত পরিশ্রম করে অ্যানকিং-এ খনি আবিষ্কার করেছি আমরা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন? চার ভাগের তিনভাগ ইউরেনিয়ামই চুরি হয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত কোনও কৌশলে। বহু চেষ্টা করেও আমরা এই চুরি বন্ধ করতে পারিনি। বহু রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এমন কি দুই-দুইবার পুরো স্টাফ বদলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাগজে কলমে যে হিসেব দেখা যায়, মাল পাওয়া যায় তার চারভাগের একভাগ। কি উপায়ে যে এই চুরিটা চলছে তা আমাদের ধারণার বাইরে।'

একমিনিট চুপ করে থেকে মনে মনে গুছিয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল কথাগুলো। রানা মাত্র ভাবতে শুরু করেছে, চুরি হচ্ছে তো সে কি করবে, এই ব্যাপারেই কি ওকে ডেকে আনা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে—এমন সময় আবার আরম্ভ করলেন অ্যাডমিরাল হো ইন্।

'আপনাকে এই চোর ধরবার জন্যে আমরা নিমন্ত্রণ করিনি, মি. মাসুদ রানা। অন্য কাজে এনেছি। আগে ভূমিকাটুকু সেরে নিই। যা বলছিলাম, এই ইউরেনিয়াম। একটা ব্যাপার আমরা কিছুদিন হলো পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি—ইউরেনিয়াম আসলে পাচার হয়ে যাচ্ছে বাইরে। অ্যানকিং থেকে সাংহাই, সেখান থেকে ক্যান্টন, তারপর বুঝতেই পারছেন—হংকং। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কোনও গ্যাঙ পরিচালনা করছে এই চুরি এবং স্মাগলিং। এবং শুনলে আশ্চর্য হবেন, রাজনৈতিক কারণে এই দলকে অপরিমিত অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে এবং দশগুণ বেশি দাম দিয়ে এ

'ইউরেনিয়াম কিনে নিচ্ছে কোনও এক বা একাধিক ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র। নাম না বললেও নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আপনার। যারা আমাদের পারমাণবিক শক্তি অর্জনকে সুনজরে দেখছে না, এটাকে ওদের কর্তৃত্ব এবং নিরাপত্তার ওপর স্পষ্ট হুমকি বলে মনে করছে, তারা আমাদের এই অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত। কেবল অর্থ নয়—বুদ্ধি দিয়ে, শক্তি দিয়ে, সর্বপ্রকারে তারা সাহায্য করছে ওই গ্যাঙটিকে। আমরা কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারছি না। আমাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।'

শহরে প্রবেশ করবার কয়েক মিনিট আগে পকেট থেকে একটা চশমা বের করে দিলেন অ্যাডমিরাল রানাকে। চশমার সাথেই একটা নকল নাক এবং নাকের নিচে পুরু একজোড়া গোঁফ লাগানো। সেটা পরে নিয়ে রিয়ার-ভিউ মিররে নিজের চেহারাটা দেখে হেসে ফেলল রানা। ভাবল, গোঁফ রাখলে নেহায়েত মন্দ দেখাত না ওকে। প্রশস্ত পীচঢালা আলোকিত রাজপথ ধরে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল কালো ক্যাডিলাক।

'তা, আমি আপনাদের কি সাহায্যে লাগতে পারি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল রানা। ওর কাজটাই এখনও শোনা হয়নি।

'সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। সাংহাইয়ে এই মুহূর্তে কয়েক আউন্স ইউরেনিয়াম তৈরি আছে। হংকং যাবে সেগুলো। আমাদের সাংহাই-চীফ জানতে পেরেছেন কে এগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেই লোকটির ওপর নজর রাখবার জন্যেই বা কে যাচ্ছে তার সঙ্গে।'

'তাদের নিশ্চয়ই অ্যারেস্ট করা হয়েছে?'

'একজনকে করা হয়েছে। অপর জনকেও গ্রেপ্তার করা যেত, কিন্তু সেটা করলে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে। এদের ধরে যে কথা আদায় করা যাবে না তা ভাল করেই জানা আছে আমাদের। তাই আমাদের নিজেদের একজন লোককে পাঠাতে চাই সেই অ্যারেস্টেড্ লোকটার বদলে।'

'তারপর?'

'তারপর সেই মাল স্মাগল্ করে নিয়ে যাবে আমাদের লোকটি হংকং-এ।'

দুই

'কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। সবকিছু জানিয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করবার সময় ছিল না। কিন্তু এখনও আপনি ভেবে দেখতে পারেন,' বলল সাংহাই-চীফ কর্নেল লু সান।

হোটেলে পৌঁছে লু সানের হাতে রানাকে সমর্পণ করে বিদায় নিয়েছেন অ্যাডমিরাল হো ইন। স্নানের পর একটা সোফায় এসে বসেছে রানা। পাশের টিপয়ের ওপর ধূমায়িত কফির কাপ তৈরি। সামনাসামনি আরেকটা সোফায় বসে আছে লু সান রানার দিকে উৎসুক নয়নে চেয়ে।

'কেন মিছেমিছি এইসব কথা তুলে সময় নষ্ট করছেন, মি. লু সান? আমি যে-কোনও অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আপনাদের কোনও কাজে লাগতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। তাছাড়া আপনাদের ক্যালকাটা-চীফ লিউ ফু-চুং আমার বিশেষ বন্ধু—তার কাছে ঋণীও আছি আমি।'

আঙুলের ফাঁকে ধরা মোটা চুরুটটা এক ইঞ্চি পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল—সেটাতে শেষ একটা টান দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফেলে দিল লু সান অ্যাশট্রেতে। ছ্যাঁৎ করে নিভে গেল আগুনটা। তারপর পকেট থেকে গোটাকয়েক ফটোগ্রাফ বের করে রাখল সামনের টেবিলের ওপর। ঠেলে দিল রানার দিকে।

বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা আজই সকালে দেখা সেই লোকটির ছবি।

'এই সেই লোক। বাঙালী হিন্দু। যে ওকে চেনে না, কেবল চেহারার বর্ণনা শুনেছে, তার কাছে ওর বদলে আপনাকে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যাবে। নাম অরুণ দত্ত। দুই পুরুষ থেকে সাংহাইয়ে আছে। ভাল বংশের শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। কলেজে উঠেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং নষ্টই রয়ে গেছে। গুণ্ডা বদমাইশের কুসংসর্গে পড়েছিল অল্পবয়সে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবও ওর কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। সৎপথে উপার্জনের শত রাস্তা থাকলেও সে নিত্য-নতুন ঠকবাজি করে বেড়াচ্ছে এখনও—সুযোগ পেলেই চুরি করছে, ট্রেনে ডাকাতি করছে, পকেট মারছে। দুই একবার ধরা পড়েছিল পুলিস এবং ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কাছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে হয়েছে। গোটাকয়েক মেয়েকে কৌশলে লাগানো হয়েছিল ওর পেছনে। একজনের সঙ্গে খাতির বেশ ঘন হয়ে উঠেছে ওর ইদানীং। গতকাল হঠাৎ এই ইউরেনিয়াম স্মাগলিং-এর কথা বলে ফেলেছে সে মেয়েটির কাছে। তেমন কোনও গুরুত্ব দেয়নি সে এই কাজের ওপর। আসলে এটা ওর লাইনই নয়।'

'হ্যাঁ। এক লাইনের কুশলী অন্য লাইনের কাজকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারে না। ওর চুরির কথা হলে কিছুতেই হয়তো বলত না সে কারও কাছে।'

'মরে গেলেও না। যাক, মেয়েটি খবরটা পাওয়া মাত্রই রীলে করেছে পুলিসের কাছে। কয়েকটা গোপন হাত ঘুরে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে খবরটা আজই ভোর ছ'টায়।'

এদের কর্মদক্ষতা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারল না রানা। আজকের মধ্যেই প্ল্যান তৈরি করে দুনিয়াময় তোলপাড় করে ফেলেছে! সেজন্যেই বলে: হুজ্জতে বাঙ্গাল, হেকমতে চীন।

'ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই রকম,' আবার আরম্ভ করল লু সান, 'কোনও এক বন্ধুর বন্ধু ওকে দিয়ে একটা স্মাগলিং-এর কাজ করাতে চায়। সে রাজি হয়ে গেছে। হংকং-এ মাল পৌঁছে দিলেই দশ হাজার হংকং ডলার পাবে সে। তারপর ফিরে এসে খুব মজা করতে পারবে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল আফিম কিনা। উত্তর এল, না। তাহলে কি সোনা? হেসে বলল, না গো না, গরম জিনিস, ইউরেনিয়াম। মাল হাতে এসে গেছে কিনা জিজ্ঞেস করায় বলল, না। আগামীকাল আটটায় (অর্থাৎ, আজ রাত আটটায়) হোটেল স্যাভয়ে মায়া ওয়াং নামে একটা মেয়ের সাথে দেখা করবার কথা আছে। সেই মেয়েটিই বলে দেবে কি করতে হবে ওকে।'

রানা চট্ করে ঘড়িটা দেখে নিল একবার। সাংহাইয়ে নেমেই এখানকার সময়ের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিল ঘড়িটা। সোয়া সাতটা বাজে। অর্থাৎ আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই ওকে দেখা করতে হবে সেই মেয়েটির সাথে অরুণ দত্তের ছদ্মবেশে। পাকস্থলীর মধ্যে এক ধরনের বিজাতীয় সুড়সুড়ি অনুভব করল সে। সেই স্মাগলিং, মালবাহক, তার ওপর নজর রাখবার জন্যে আরেকজন, সেই কাস্টম্স্। কয়েক বছর আগে পি.সি.আই-এর হয়ে ওকে কিছুদিন এ ধরনের কাজ করতে হয়েছে। সেই হাতের তালু ঘেমে ওঠা। সব মনে পড়ল রানার ছবির মতন।

নতুন আরেকটা চুরুট ধরিয়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে লু সান।

'বুঝলাম,' বলল রানা। পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে ফিরল লু সান। 'তা আমার কাজটা কি হবে?'

'প্রথম কাজ, আমাদের বর্ডার ক্রস করবার পর অতি সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করা। কারণ, আমরা জানি না, মাল হাতে পেয়ে ওরা কি করবে। কথামত সত্যি সত্যিই টাকা দেবে, না স্রেফ হাঁকিয়ে দেবে, না মুখ বন্ধ করবার জন্যে সরিয়ে দেবে চিরতরে। কিছুই জানা নেই। তাই আত্মরক্ষার জন্যে সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে আপনাকে। যদি টাকা দেয় তাহলে আপনাকে দেখতে হবে কে দিচ্ছে টাকাটা। আবার আপনাকে এই কাজে বা অন্য কাজে ব্যবহার করতে ওরা রাজি কিনা। যদি আপনাকে ওদের পছন্দ হয় তাহলে ওদের দলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চিনে নিতে আপনার অসুবিধে হবে না। আমাদের জানতে হবে কারা এই কাজটা চালাচ্ছে, কে লীডার, ইত্যাদি সব রকমের তথ্য। অল্পদিনেই ওদের হেডের সঙ্গে দেখা হবে আপনার। কারণ, বড় বড় গ্যাঙে নতুন লোক ভর্তি হলে নেতৃস্থানীয়রা প্রথমেই যাচাই করে নিতে চাইবে ভাল মত।'

'তা নাহয় হলো। কিন্তু ইউরেনিয়াম নিয়ে যাচ্ছি, ইন্স্পেক্টোস্কোপে ধরা পড়ে বেইজ্জত হব না তো আবার?'

'না। সেদিকে আমরা লক্ষ রাখব।'

'যাক। বোঝা যাচ্ছে আজকের পরীক্ষায় পাস করলে হংকং-এ প্রথম যার সংস্পর্শে আসব তাকে খুশি করতে পারাটাই আসলে কঠিন হবে। তারপর বাকি কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু এখন আগের কথা আগে। প্রথমেই মেয়েটার কাছে ধরা পড়ে যাব না তো?'

'মনে হয় না।'

'অরুণ দত্ত সম্পর্কে কিছুই জানে না মেয়েটা?'

'জানে। নাম আর চেহারার বর্ণনা। আমাদের অনুমান, এর বেশি সে কিছুই জানে না। এমন কি যে লোকটা অরুণ দত্তকে কন্ট্যাক্ট করেছে তাকেও সে চেনে কিনা সন্দেহ। ওদের কাজের ধারাই এই। প্রত্যেকের জন্যে ছোট্ট নির্দিষ্ট কাজ, তার বেশি সে আর কিছুই জানে না। কাজেই, যদি কোনও একজন ধরা পড়ে তাহলে একটা সামান্য লিঙ্ক কাটা পড়ে মাত্র—পুরো চ্যানেল বন্ধ হয় না। কর্তা ব্যক্তিদেরও অসতর্ক মুহূর্তে হাতকড়ার আশঙ্কা থাকে না।'

'মেয়েটির সম্পর্কে কোনও তথ্য বলতে পারবেন?' হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল রানা।

'তেমন কিছু নয়। পাসপোর্টে যা পাওয়া গেছে তার বেশি নয়। হংকং-এর ন্যাচারাল সিটিজেন। বয়স পঁচিশ। কালো চুল, কালো চোখ। লম্বা: পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। প্রফেশন: অবিবাহিতা। গত দু'বছরে বার দশেক এসেছে সাংহাইয়ে। অন্য নামে আরও এসে থাকতে পারে। প্রতিবারই হোটেল স্যাভয়ে উঠেছে। হোটেল ডিটেকটিভের কাছে জানা গেছে বিশেষ বাইরে বেরোয় না মহিলা। কদাচিত এক আধজন দর্শনপ্রার্থী আসে ওর ঘরে। আধঘণ্টা থেকেই চলে যায়। সপ্তাহ খানেকের বেশি কোনও বারই থাকে না সে সাংহাইয়ে। হোটেলের শৃঙ্খলা এবং নিয়ম-কানুন কখনও ভঙ্গ করে না—কোনও উৎপাত নেই। ব্যস্। আর কিছুই জানা যায়নি। কিন্তু এটা ঠিক যে অত্যন্ত ধুরন্ধর মেয়ে হবে সেটা। ভাল মত বাজিয়ে নেবে আপনাকে। আপনি কেন একাজ করছেন সে-সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানিয়ে বলতে হবে আপনার।'

'সে দেখা যাবেখন।'

'আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে আপনার?' বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইল লু সান।

'না।'

তৈরি হয়ে নিল রানা। ইচ্ছে করেই ওর ওয়ালথারটা নিল না সাথে। হাত ঘড়িতে বাজে পৌনে আটটা। নেমে এল সে নিচে লিফটে করে। অসংখ্য গাড়িঘোড়া চলছে জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাস্তায়। হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল সে দৃঢ় পায়ে।

তিন

লিফট্ থেকে বেরিয়ে লম্বা করিডর ধরে যেতে যেতে রানা স্পষ্ট অনুভব করল লিফটম্যান লক্ষ করছে ওকে। নিচেও গেটের কাছে দাঁড়ানো সাদা পোশাক পরা দু'জন লোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করেছিল রানাকে। আশ্চর্য না হলেও অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করল। কারা এরা? কোন্ দলের? বুঝবার উপায় যখন নেই, তখন বোকা সেজে থাকাই ভাল। সোজা এসে দাঁড়াল সে একশো সাত নম্বর কামরার সামনে।

দরজার ওপাশ থেকে সুরেলা কণ্ঠের গুনগুন আওয়াজ পাওয়া গেল। কোনও পপুলার গানের কলি ভাঁজছে মেয়েটি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শুনল রানা কিছুক্ষণ। তারপর টোকা দিল দরজায়।

থেমে গেল মৃদু গুঞ্জন।

'ভেতরে আসুন,' দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল আদেশের সুর। নিচ থেকে রিসেপশনিস্টের টেলিফোন পেয়ে অপেক্ষা করছিল সে রানার জন্যে।

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। ছোট্ট একটা সাজানো গোছানো লিভিং রূম।

'তালা লাগিয়ে দিন দরজায়,' আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল পাশের বেডরূম থেকে।

চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে ঘরের মাঝবরাবর আসতেই বেডরুমের খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল সে মেয়েটিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে দরজার সামনে।

শুয়ে রয়েছে মেয়েটা ইজিচেয়ারে। ডান পা-টা তুলে দিয়েছে ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর। হাইহিল জুতো পরা সে-পায়ে। পা-টা নাচাচ্ছে সে অল্প-অল্প। দুই বাহু মাথার পেছনে বালিশের কাজ করছে। দেহের প্রতিটি রেখায়, বসবার ভঙ্গিতে, চোখের চাউনিতে একটা উদ্ধত দুর্বিনীত ভাব। অথচ অদ্ভুত সুন্দরী।

কোন কথা না বলে এক মিনিট রানাকে পরীক্ষা করল মেয়েটি পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ওর চোখে চোখে চেয়ে মৃদু হাসল রানা। কিন্তু কাজ হলো না। গম্ভীর মুখে পর্যবেক্ষণ শেষ করে মেয়েটি বলল, 'আপনিই বোধহয় আমাদের নতুন হেলপার? আপনার নামই অরুণ দত্ত?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বেশ। তা বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন কলাগাছের মত? না, না, এই ঘরে নয়—আক্কেল থাকা উচিত, এটা অবিবাহিতা ভদ্রমহিলার শোবার ঘর। ওই ঘরেই বসুন।'

পাশের ঘরে সোফায় বসে পড়ল রানা। এমন জায়গায় বসল যেখান থেকে মেয়েটিকে দেখতে পাওয়া যায়। বসেই চোখ তুলে দেখল তার দিকে চেয়ে আছে মেয়েটি। মুখে দুর্বোধ্য এক টুকরো হাসি। রানাকে চাইতে দেখেই মিলিয়ে গেল হাসিটা।

সাবলীল ভঙ্গিতে ডান পা-টা নামিয়ে নিল মেয়েটি ইজি চেয়ারের হাতল থেকে। একবার আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। তারপর উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। অবাক চোখে চেয়ে রইল রানা মেয়েটির দিকে। অপূর্ব সুন্দরী।

'এক মিনিট। আসছি এক্ষুণি,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল মায়া ওয়াং। হাইহিলের খুট খুট শব্দ তুলে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল সে। আবার সুরেলা কণ্ঠের গুনগুন গান ভেসে এল পাশের ঘর থেকে। চীনা সুর। বাঙালী শ্রোতার কানে কেমন বিজাতীয় ঠেকে।

এ-ধরনের একটা মেয়ে যে ছায়ার মত অনুসরণ করবে ওকে হংকং না পৌঁছানো পর্যন্ত ভাবতেও পারেনি রানা। অন্য রকম স্ত্রীলোক আশা করেছিল সে। দুর্দান্ত প্রকৃতির হওয়াটাই স্বাভাবকি— কিন্তু এই ঔদ্ধত্য, এই বন্য সৌন্দর্য যেন এ ধরনের কাজের সাথে ঠিক খাপ খায় না। বিপজ্জনক কাজে এরা বিপদ বৃদ্ধিই করে শুধু, কাজে আসে না। ড্যান্সার হলেই যেন ওকে মানাত বেশি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটা লাল মখমলের চিওংসাম পরে বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল মায়া। বাঁ হাতে একটা ছোট্ট সোনার রিস্টওয়াচ কালো বেল্ট দিয়ে বাঁধা। অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে হীরের আঙটি। কানে সোনার ঝুমকো। ঠোঁটে ভারমিলিয়ন রেড লিপস্টিক। চুলগুলো পনি টেল করা। প্রশস্ত কপাল, হালকা ভুরু আর ঈষৎ টানা চোখ ছাড়া চীনা মহিলা বলে চিনবার উপায় নেই। নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রয়েছে মেয়েটি রানার দিকে। রানাও বিস্মিত হয়ে দেখল ওর অতুলনীয় সৌন্দর্যের আরেক দিক।

'আপনিই তাহলে অরুণ দত্ত?' ঠাণ্ডা গলায় আবার জিজ্ঞেস করল মায়া।

'হ্যাঁ। আমার নিজের অন্তত সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

বাঁকা উত্তর শুনে রানার চোখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে বিরক্তি বর্ষণ করল মায়া ওয়াং। তারপর রানার মুখোমুখি বসল এসে সোফার ওপর যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সাথে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ডান পা-টা বাম হাঁটুর ওপর তুলে গোড়ালি থেকে সামনেটুকু প্রবল বেগে নাচাতে থাকল রানা।

'কাজের কথায় আসা যাক,' কর্তৃত্বের সুর মেয়েটির কণ্ঠে। 'নিজের লাইন ছেড়ে এই কাজটা নিতে চাইছেন কেন?'

'খুন।'

একটু চমকে উঠে চট্ করে চাইল মায়া রানার চোখের দিকে।

'ও। আমি শুনেছিলাম আপনি চুরি-চামারি লাইনের লোক।'

'শুধু চুরি। চামারি নয়,' আপত্তি জানাল রানা।

'যাই হোক, খুনটা কি রাগের মাথায়, না ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে?'

'রাগের মাথায়। মারামারি।'

'কাজেই এখন ভাগবার মতলবে আছেন?'

'তা বলতে পারেন। তাছাড়া টাকাও পাওয়া যাচ্ছে অনেক।'

'কাঠের পা কিংবা বাঁধানো দাঁত আছে?'

'না। দুঃখিত। সবকিছু সাচ্চা।'

বিরক্তি প্রকাশ পেল মেয়েটির ঠোঁটের দুই কোণে।

'প্রতিবার বলছি ওদের একজন পা ভাঙা লোক জোগাড় করতে—কিছুতেই পারে না। যাকগে, খেলাধুলায় শখটখ আছে? কিসে করে জিনিসটা নিয়ে যাবেন? ভেবেছেন কিছু? কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন না?'

'না। গ্রামোফোন আর রেডিও ছাড়া অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র জীবনে ছুঁইনি। তবে তাস খেলতে পারি। তাছাড়া টেনিসেও হাত আছে। কিন্তু আমার ধারণা, এসব জিনিস সুটকেসের হ্যাণ্ডেলের ভেতর বেশ চমৎকার ভরে নিয়ে যাওয়া যায়।'

'কাস্টমসেরও তাই ধারণা।'

এক কথায় রানাকে চুপ করিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল মায়া ওয়াং ভুরু কুঁচকে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। পাসপোর্ট আছে আপনার?'

'আছে! কিন্তু ছদ্মনামে।'

'ছদ্মনাম কি রকম?' সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল মায়া ওয়াং।

'খুলে বললেই বুঝতে পারবেন। আসলে আমার একটা সাইড বিজনেস আছে, জাল নোট তৈরির। কয়েক জায়গায় প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। তাই সময় থাকতে কেটে পড়তে চাই যন্ত্রপাতিসহ। স্বনামে চেষ্টা করলে এদেশ থেকে বেরোতে দেবে না আমাকে। কাজেই পাসপোর্ট জাল করতে হলো। আর পাসপোর্ট যদি জাল করতে হয় তবে বাংলাদেশী পাসপোর্ট তৈরি করাই সবচেয়ে নিরাপদ। আমার ধারণা, বাংলাদেশী হিসেবে রীতিমত খাতির যত্ন পাব কাস্টমস অফিসারের কাছে। তাই নাম নিয়েছি মাসুদ রানা।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানাকে লক্ষ করছিল এতক্ষণ মায়া ওয়াং। রানার এ গল্পটা কেন জানি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করল সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'সেই

পাসপোর্ট তৈরি আছে তো?'

'সঙ্গেই আছে। দেখাব?'

'না। তার দরকার নেই। দু'দিনের মধ্যে রওনা হতে পারবেন?'

'না পারার তো কোন কারণ দেখি না। বিয়ে-শাদী করিনি যে পিছু টান থাকবে। বলেন তো আজই ভেসে পড়তে পারি আপনার সঙ্গে।'

শেষের বাক্যটা বোধহয় শুনতে পায়নি মায়া ওয়াং। দ্বিতীয়টা নিয়েই চিন্তা করছিল। স্থির শান্ত গলায় বলল, 'বেশ। এখন মন দিয়ে শুনুন। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবেন হংকং-এ মিস্টার সি.ওআই.লিউঙের কাছে যাচ্ছেন আপনি। বহুদিনের পুরানো বন্ধু সে আপনার। যুদ্ধের সময় থেকে ঘনিষ্ঠতা।' গলার স্বর একটু বদলে নিয়ে যোগ করল, 'আসলে এই নামে সত্যিই আছে একজন। প্রয়োজন হলে সে আপনার এই বানানো গল্প সমর্থন করবে।'

উঠে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মায়া ওয়াং। ড্রয়ার খুলে এক তাড়া নোট বের করল। রাবার ব্যাণ্ড খুলে আন্দাজের ওপর অর্ধেক করল নোটগুলো। অর্ধেক রেখে দিল ড্রয়ারে। তারপর বাকি অর্ধেকে আবার রাবার ব্যাণ্ডটা পরিয়ে ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। নিচু হয়ে মেঝের কাছে ক্যাচ ধরল সেটা রানা।

'এই টাকা দিয়ে লঙ কী হোটেলে আজই একটা কামরা বুক করবেন। ইমিগ্রেশনে এই ঠিকানাই দেবেন। একখানা পুরানো সুটকেস জোগাড় করে তার মধ্যে গোটাকয়েক পুরানো এবং গোটাকয়েক নতুন টেনিস বল রাখবেন ওপর দিকেই—আর টেনিস র‍্যাকেটের জন্যে জায়গা খালি রাখবেন। আমার ধারে-কাছেও আর ঘেঁষবেন না। পরশু সকাল সাড়ে দশটার ফ্লাইটে হংকং যাচ্ছেন আপনি—কালই টিকেট করে ফেলবেন। পরশু অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টায় আমাদের গাড়ি তুলে নেবে আপনাকে লঙ কী থেকে। একটা টেনিস র‍্যাকেট দেবে ড্রাইভার আপনাকে। বাক্সে রাখবেন সেটা এবং—' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে চাইল মায়া ওয়াং, 'মাল নিয়ে কেটে পড়বার বৃথা চেষ্টা করবেন না। নির্ঘাত মারা পড়বেন তাহলে। আপনার লাগেজ প্লেনে ওঠার আগে পর্যন্ত আপনার আশেপাশেই থাকবে ড্রাইভার। আমি থাকব সাংহাই এয়ারপোর্টে। আরও লোক থাকতে পারে। কাজেই কোন রকম চালাকি খাটবে না। বুঝতে পেরেছেন?'

বাঁ হাতের তালু ঘুরিয়ে অবাক হওয়ার ভান করল রানা। 'ও জিনিস দিয়ে আমি কি করব? ও আমার আওতার বাইরে। যাক, হংকং পৌঁছে কি হচ্ছে?'

'আরেকজন ড্রাইভার অপেক্ষা করবে সেখানে আপনার জন্যে। সে-ই বলবে কি করতে হবে আপনাকে। আর যদি কাস্টমসে ধরা পড়ে যান, আপনি বলবেন আপনি কিছুই জানেন না। বুঝেছেন? কি করে ওই র‍্যাকেট আপনার সুটকেসে এল আপনি জানেনই না। বোবা বনে যাবেন। তাজ্জব হয়ে যাবেন। দেখবেন, সবকিছু আবার ফাঁস করে দেবেন না। আমি আপনার সমস্ত কার্যকলাপ দেখব—খুব সম্ভব আরও এক-আধজন দেখবে। আমি তাদের চিনি না। তারা আমার এবং আপনার দু'জনের ওপরই নজর রাখবে। যাই হোক, আমরা কেউই কোন সাহায্য করতে পারব না আপনাকে। কাজটায় রিস্ক আছে, সেজন্যেই এত টাকা দেয়া হচ্ছে আপনার মত একজন অপদার্থকে। পরিষ্কার হয়েছে কথাটা? যদি ধরা পড়েন,

আমরা ছায়ার মত মিলিয়ে যাব।'

'রাজি। মিলিয়ে না গেলেও ভয়ের কিছু নেই। আপনি ছাড়া ফাঁসাবার মত কাউকে পাচ্ছি না আমি হাতের কাছে। আর, বিশ্বাস করুন, প্রাণ থাকতে আপনাকে কোন রকম বিপদে ফেলব না আমি।'

'হয়েছে, হয়েছে,' বিদ্রূপের হাসি হাসল মায়া ওয়াং। 'আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। কাজেই আমার জন্যে আপনার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক না ঘামালেও চলবে।' রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'আর দয়া করে কচি খুকিও ঠাওরাবেন না আমাকে। কাজে নেমেছি যখন, তখন আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতাও আমার আছে। কার্যক্ষেত্রে আমার ক্ষমতার পরিচয় পেলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি।'

উঠে দাঁড়াল রানাও। অসহিষ্ণু মায়া ওয়াং-এর জ্বলন্ত চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু হাসল। বলল, 'যে-কোনও কাজ আপনার চেয়ে ভাল পারব আমি। ভাববেন না। আমাকে পেয়ে লাভই হবে আপনার। কিন্তু এক মিনিটের জন্যে আপনার মিলিটারি মেজাজ আর মাতব্বরির ভাবটা ছাড়ুন তো। আপনার বন্ধুত্ব চাই আমি। সব যদি ভালয় ভালয় চুকে যায় তাহলে হংকং পৌঁছে আবার আপনার সাথে দেখা হতে পারে না?'

কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে ভেতর ভেতর একটু খারাপ লাগল রানার। মেয়েটিকে ভাল লেগেছে ওর। বন্ধুত্ব যদি হয় ভালই। কিন্তু রানার আসল উদ্দেশ্য এই বন্ধুত্বের সুযোগে ওদের দলে ঢোকা। বন্ধুত্বকে স্বার্থের খাতিরে ব্যবহার করতে চিরদিনই ঘৃণা বোধ করে সে। কিন্তু করতেই হবে। কর্তব্য ইজ কর্তব্য।

রানার চোখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এল মায়ার জ্বলন্ত দৃষ্টিটা। অসহিষ্ণু কর্তৃত্বের ভাবটা চলে গেল চেহারা থেকে। এই প্রথম সে স্পষ্ট অনুভব করল কতখানি শক্তিশালী একটা ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। রানার মধ্যেকার প্রবল পৌরুষ এবং প্রচণ্ড ক্ষমতার বিচ্ছুরণ অভিভূত করে ফেলল ওকে। মেয়েমানুষের এ ব্যাপারে ভুল হয় না। দেরিতে হলেও উপলব্ধি করল মায়া ওয়াং, সত্যিই তার সামনে দাঁড়ানো লোকটির তুলনায় কোনও দিক থেকে সে কিছুই নয়। লোভনীয় ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো একটু। আড়ষ্ট হয়ে এল কথাগুলো।

'আমি, আমি···মানে,' থেমে গিয়ে ঢোক গিলল মায়া। তারপর নিচু গলায় বলল, 'বুধবার কোনও কাজ নেই আমার। সন্ধ্যায় ডিনার খেতে পারি আমরা একসাথে। আটটায়। কাউকে কিছু বলতে পারবেন না এ ব্যাপারে। রিপাল্‌স্‌ বে হোটেল। ভিক্টোরিয়া থেকে আধঘণ্টার পথ। আপনার অসুবিধে আছে?' রানার চোখের দিকে না চেয়ে ঠোঁটের দিকে চেয়ে রইল মায়া ওয়াং।

'চমৎকার হবে। অসুবিধে কি? হংকং পৌঁছে আর কাজ নেই আমার। বুধবারের অপেক্ষায় আজ থেকেই আমার দিন কাটতে চাইবে না আর।' রানা ভাবল আর বেশি ঘাঁটানো ঠিক হবে না। কোনও কিছু ভুল করে বসবার আগেই কেটে পড়তে হবে এখান থেকে। 'যাক, আর কিছু বলবার আছে?' আবার কাজের কথায় ফিরে গেল সে।

ঘোরটা কেটে গেল মায়ার। 'না।' বলে কি যেন মনে পড়ল ওর। চট করে জিজ্ঞেস করল, 'কয়টা বাজে এখন?'

একটু আগেই ঘড়ির দিকে চেয়েছিল রানা। তাই নিজের ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে মায়ার সোনার রিস্ট-ওয়াচের দিকে চেয়ে বলল, 'পৌনে নয়।'

'ভুলেই গেছিলাম, কাজ আছে আমার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল মায়া। রানা চলল পেছন পেছন। তালাটা খুলে দরজা খুলবার আগে ঘুরে দাঁড়াল মায়া ওয়াং। চোখের দৃষ্টিতে রানার ওপর বিশ্বাস আর বন্ধুত্বের ভাব। বলল, 'আপনি পারবেন। শুধু প্লেনে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবেন। আর যদি কিছু গোলমাল হয় তাহলে ভয় পাবেন না। এবার যদি ঠিকমত কাজ করতে পারেন, এ ধরনের কাজ আপনাকে আরও জোগাড় করে দেবার চেষ্টা করব। আর,' একটু হাসল মায়া, 'আর আমাদের যে আবার দেখা হবে সে-কথাটা গোপন রাখবেন। কোনওভাবে যদি প্রকাশ পায়, তাহলে আর কোনদিনই দেখা হবে না।'

'কথাটা মনে রাখব। আমার মনের অবস্থা জানলে এতবার করে সাবধান করতেন না।'

কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে দরজা খুলে হাঁ করে দিল মায়া ওয়াং। রানা বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল করিডরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, অবাক হয়ে দেখল ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করছে মায়া ওকে। মৃদু হাসল রানা। এ হাসিরও কোন প্রত্যুত্তর এল না মায়ার কাছ থেকে। স্থির দৃষ্টিতে রানার চোখে চোখ রেখে ধীরে এবং দৃঢ় হাতে বন্ধ করে দিল সে দরজাটা রানার মুখের ওপর।

লম্বা করিডর ধরে চলে গেল রানা লিফটের দিকে। চুপচাপ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে রইল মেয়েটি। রানার জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। ফিরে এল সে শোবার ঘরে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গুনগুন করে গান ধরল একটা। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই গান থামিয়ে ভাবতে লাগল ওই নিষ্ঠুর চেহারার বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান লোকটার কথা। একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

ঠিক যখন ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, বেরিয়ে এল মেয়েটি হোটেল থেকে বাইরে। রাস্তা পার হয়ে হাঁটতে থাকল দক্ষিণে। নয়টার সময় পৌঁছল সে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদে। তিনবার রিং হতেই ওপাশের রিসিভার উঠানোর ক্লিক শব্দ পাওয়া গেল। চুপচাপ শুনতে থাকল সে টেপ রেকর্ডারের খশখশ শব্দ।

পুরো এক মিনিট পর ওপাশ থেকে একটা শব্দ কানে এল।

'বলো।'

হাতের রুমালটা মুখের ওপর রেখে বলল মেয়েটি, 'মায়া বলছি। নতুন হেলপার ঠিক আছে। টেনিস খেলে। র‍্যাকেট নেবে সাথে। আই রিপিট। র‍্যাকেট নেবে সাথে। বাকি ব্যবস্থা সব ঠিক। দশটা পাঁচে রিং করব আবার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে হোটেলে ফিরে এল মায়া ওয়াং। বারবার ওই লোকটার কথা মনে আসছে কেন? বারবার ওর মুখের চেহারাটা ভেসে উঠছে কেন চোখের সামনে?

চার

মঙ্গলবার সকাল নয়টার মধ্যেই মালপত্র গোছগাছ করে তৈরি হয়ে নিল মাসুদ রানা। এককালে যার দাম এবং চাকচিক্য ছিল প্রচুর, এমনি একটা পুরানো দুমড়ানো সুটকেস জোগাড় করে ফেলেছে সে। একজন টেনিস খেলোয়াড়ের সুটকেসের মতই দেখতে হয়েছে সেটা। একজোড়া দামী স্যুটের সাথে খেলার পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি একজোড়া দুর্গন্ধযুক্ত কেড্‌স্ পর্যন্ত আছে তার মধ্যে। কয়েকটা ডানলপ বল আছে নতুন পুরানো মেশানো। গোটাকতক সাদা শার্ট, একজোড়া নাইলনের মোজা, চারটে আণ্ডারওয়্যার, তার মধ্যে দুটো স্পোর্টস মডেল, ইত্যাদিতে প্রায় ভরে এসেছে সুটকেসটা।

এবারে একটা ছোট অ্যাটাচি কেসে সাবান, টাওয়েল, ইলেকট্রিক শেভ, 'হাউ টু প্লে পোকারে'র একটা অর্ধেক মলাট ছেঁড়া বই, পাসপোর্ট আর টিকেট রাখল সে সাজিয়ে। এর একটা গোপন কুঠুরিতে ওর ওয়ালথারের জন্যে একটা সাইলেন্সার এবং চারটে এক্সট্রা ম্যাগাজিন ভর্তি বত্রিশ রাউণ্ড থ্রী-টু ক্যালিবারের গুলি রাখা আছে সযত্নে।

টেলিফোন বেজে উঠল। রানা ভাবল গাড়ি এসে গিয়েছে বুঝি—কিন্তু অবাক হয়ে শুনল রিসেপশনিস্ট বলছে: ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন থেকে একজন লোক দেখা করতে চায়। চমকে উঠল রানা। আই.টি.সি! অর্থাৎ পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স! রানা জানে সাংহাইয়ে ওদের ব্রাঞ্চ আছে—কিন্তু তাদের সাথে নিষ্প্রয়োজন বোধে যোগাযোগ করেনি সে ইচ্ছে করেই। তাছাড়া সময়ও কম। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে কি সংবাদ নিয়ে এল পি.সি.আই.? এরাও তাহলে চোখ কান খোলা রেখেছিল?

'সোজা ওপরে পাঠিয়ে দিন,' বলল রানা।

কয়েক মিনিট পর ঘরে ঢুকল একজন শান্তশিষ্ট চেহারার বাঙালী ভদ্রলোক। পাতলা, লম্বা একহারা চেহারা—অতিরিক্ত এক ছটাক মাংস নেই গায়ে। ছিমছাম পোশাক পরিচ্ছদ। স্টিফ কলার সাদা শার্ট, লাল বো টাই। মুখে মৃদু হাসি। চোখ দুটোতে শিশুসুলভ সারল্য। পুরু গোঁফটা মুখের সাথে বেমানান।

'আমার নাম র‍্যাযাউল করিম।' মাথা নুইয়ে চীনা কায়দায় অভিবাদন করল সে। বুক পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিল। তারপর বলল, 'বুড়া মিঞা পাঠাইছে এইটা আপনের জইন্য। ঘাবড়াইয়া গেছে গিয়া এক্কেরে। লন, পইরা ফালান।'

বহুদিন পর বাংলা বলবার চান্স পেয়ে একেবারে অরিজিনাল ল্যাংগোয়েজ ছেড়ে দিল উপবাসী রেযাউল করিম। ওকে বসিয়ে খাম খুলে ভেতরের কাগজটা বের করল রানা। ওয়ান এইটথ্ ডাবল্ ক্রাউন কাগজে ইংরেজিতে টাইপ করা। নিচে বা ওপরে কোনও নাম নেই। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

'আমরা অনেক খোঁজ খবরের পর অনুমান করেছি যে তোমার এই অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে বিশ্বকুখ্যাত রেড লাইটনিং টং-এর সাক্ষাৎভাবে জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে। এটা কোন ধর্মীয় দল নয়—পুরোপুরি ক্রিমিনাল। হংকং-এ এরাই সর্বশক্তিমান হলেও আসলে এদের হেড কোয়ার্টার হচ্ছে ম্যাকাও। নারকোটিক্স্, গোল্ড স্মাগলিং, অরগানাইজ্‌ড্ প্রসটিটিউশন, বিরাট স্কেলে জুয়া, ইত্যাদি থেকে নিয়ে হেন কাজ নেই যা এরা করে না। এদের বিরুদ্ধে হংকং-এ আইনত কিছুই করা যাবে না। শক্তি দিয়ে দমন করা তো চিন্তারও বাইরে। সরকারী উঁচু মহলে এদের নিজস্ব লোক আছে। দলপতির নাম চ্যাঙ।

'কাজেই, লাইটনিং টং-এর সাথে যদি সংঘর্ষের উপক্রম হয় বা কোনও রকম খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ হেড অফিসে রিপোর্ট করে কাজ থেকে নিবৃত্ত হবে। ভদ্রতার খাতিরে প্রাণ দেয়ার প্রয়োজন নাই।

'এটাকে আমার অফিশিয়াল অর্ডার বলে জানবে।'

রানার চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠল মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের চেহারাটা। স্থির, গম্ভীর, তীক্ষ্ণ, ঋজু একটা ব্যক্তিত্ব। হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা আর ভক্তি যার হাতে সমর্পণ করে রানা নিশ্চিন্ত।

আগাগোড়া দু'বার পড়ে আনমনে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে যাচ্ছিল রানা কাগজটা—হাত বাড়াল রেযাউল করিম। মুখে মৃদু হাসি।

'দ্যান দেখি। আমার কাছে দ্যান। পোলাপান মানুষ, হারাইয়া ফালাইবেন দলিলটা।'

'দলিল?' অবাক হলো রানা।

'হ। দলিলই তো। এই দলিল হাতে নিয়া কেস করুম না আমি বুড়া মিঞার নামে আপনের জানাজাটা সাইরা নিয়াই!'

'কেন? বুড়ো মিঞার দোষ?' হাসল রানা।

'দোষ? এইটারে দোষ কন আপনে? এইটা শুনা। আরে, ঘাবড়াইয়া যখন গেলি, তো অখনই ইস্টপ্ কইরা দে না। জাইনা হুইনা পোলাটারে পাঠাস্ ক্যান্ ঠাঠার মুখে?'

'ঠাঠা কি?'

'ঠাঠা বুঝেন না। আঁই? ঢাকাইয়া পোলা ঠাঠা বুঝলেন না? আরে বাজ, বাজ, বজ্র। লাইটনিং টং-এর কথা কই। একবার ঝলসাইয়া উঠলে আর চারা নাই, মুহূর্তে শ্যাষ। তা যাইবেন যখন, গরীবের একটা কথা ফালায়া দিয়েন না—তেরিবেরি দেখলেই কাইটা পইরেন। নাইলে চিবির মোদে পইরা যাইবেন কোলাম। যা-তা মনে কইরেন না টং-রে।'

বক্তব্য শেষ করে রানার হাত ধরে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিল রেযাউল করিম। রানা বুঝল হালকা-পাতলা দেহে শক্তি আছে।

'আচ্ছা, এই মেসেজের কথা চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস জানে না?'

'খুব জানে। ক্রিপটোগ্রাফিতে এক্কেরে হাফেজ হইয়া গেছে না ওরা! এতক্ষণে খবরটা হজম কইরা ফালাইছে লু সান। দুনিয়ার কুনো খবর আর আ-জানা নাই।'

'ওরা জানে এই রেড লাইটনিং-এর কথা?'

'তা কইতে পারি না। বুড়ামিঞা কৈত্থেইকা এই খবর বাইর করল তা-ও জানি না। সবই তো অনুমান। কিন্তুক একটা কথা কইয়া দেই, চীনারা এক্কেরে বেদিশা হইয়া গেছে গিয়া। বোম্ সিরিয়াস। জানের পরোয়া নাই। যে-কোনও বিপদের মুখে ঠেইলা দিব আপনেরে। কাজেই নিজে হুঁশিয়ার থাইকেন। একটা মাসুদ রানা গেলে পি.সি.আই. কানা হইয়া যাইব না—আর এরাও ক্রিপটোগ্রাফির একখানা ম্যাজিক ফরটিফোর মেশিন ধরাইয়া দিয়া খুশি কইরা দিব বুড়া মিঞারে। আমরাও সিনা টান কইরা চলুম—আইতে-যাইতে দশবার কইরা সেলামালকি দিব লু সান হালায়। কিন্তু ক্ষতিটা হইল কার? ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা কইরা দেইখেন—আর হুঁশিয়ার থাইকেন। আইচ্ছা ভাই, সালামালেকুম। আপনের আবার টাইম হইয়া যাইতেছে।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। এবং সদুপদেশের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।'

বেরিয়ে গেল রেশ্বাউল করিম। হৈ-হৈ করে বেশ জমিয়ে রেখেছিল এতক্ষণ। ঘড়ি দেখল রানা—নয়টা পঁচিশ। হঠাৎ ফাঁকা লাগল ওর চারটা পাশ। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। অসংখ্য গাড়ি, বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল, বাই-সাইকেল, রিকশা আর পথচারী ব্যস্তসমস্ত করে রেখেছে রাস্তাটাকে। সবাই ছুটছে। সবারই কাজ আছে। সে-ই কেবল একাকী দাঁড়িয়ে আছে জানালার ধারে। এপ্রিলের হলুদ রোদ বিছিয়ে পড়েছে প্রকাণ্ড পার্কের সবুজ ঘাসে। একটা ফোয়ারা অনর্থক জল ছিটাচ্ছে আকাশের দিকে। একজোড়া জংলী কবুতর বিভোর হয়ে আদর করছে পরস্পরকে সাংহাই মিউজিয়ামের কার্নিসে বসে।

প্রতীক্ষা করছে রানা। প্রতীক্ষা করতে ওর কোন দিনই ভাল লাগে না। বিছানায় এসে বসে শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে শেষ বারের মত পরীক্ষা করে নিল রানা। সবগুলো গুলি বের করে নিয়ে ট্রিগারের টেনশনটা অনুভব করল সে বার কয়েক ফাঁকা ফায়ার করে। স্লাইড টেনে দেখে নিল ব্যারেলের ভেতর ময়লা আছে কিনা। আবার সন্তুষ্ট চিত্তে রেখে দিল যথাস্থানে।

'আপনার জন্যে গাড়ি এসে গেছে, স্যার,' মিনিট দশেক পর টেলিফোনে সংবাদ এল।

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল আবার রানা। যাত্রা তবে শুরু হলো। পাকস্থলীতে সেই শূন্যতার অনুভূতিটা হলো আবার। ভয় ঠিক নয়—অজানার রোমাঞ্চ। অজানার পথে পা বাড়াতে গেলে এই অনুভূতিটা হয় ওর। প্রায়ই হয়।

করাঘাতের শব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল সে। একটা বয় সুটকেসটা তুলে নিল এক হাতে। অ্যাটাচি কেসটা নিজেই নিয়ে বয়ের পেছন পেছন নেমে এল রানা নিচে। মাথা থেকে দূর করে দিল সব চিন্তা। সামনের দিকে ফেরাল সে তার সন্ধানী দৃষ্টি। হোটেল লঙ কী-র সুইং ডোরের ওপাশে যা ঘটতে চলেছে সেইটুকুই এখন ওর কাছে সত্য। আর কিছুই ভাবার দরকার নেই।

কালো একটা মার্সিডিস্ টু-টোয়েনটি দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। গাড়ির পেছনের সীটে তোলা হলো রানার সুটকেসটা।

'আপনি সামনে বসুন।' অনুরোধ নয়, আদেশের সুর ড্রাইভারের কণ্ঠে।

সামনের সীটে গিয়ে বসল রানা। হু-হু করে ছুটে চলল গাড়ি প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে।

কিছুদূর গিয়েই ডানদিকে মোড় নিল। এক্সপার্ট ড্রাইভার। চোখে গগলস্, হাতে গ্লাভস্। মেরুদণ্ড সোজা করে বসে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রাস্তার দিকে। মুখের ভাবে কাঠিন্য। রানা ভাবল আলাপ জমাবার চেষ্টা করবে। যেন সেই কথা বুঝতে পেরেই ড্রাইভারটা বলে উঠল, 'আরাম করে বসে যাত্রাটা উপভোগ করুন, মিস্টার। কথা বললে নার্ভাস ফীল করি আমি।'

হাসল রানা। ভাবল, এত স্পীডে চলতে চলতে যদি নার্ভাস হয়ে যায় তাহলেই সেরেছে। ছাতু হয়ে যাবে গাড়ি। কি দরকার বাবা বাজে আলাপে?

কয়েকটা মোড় ঘুরেই একটা নির্জন রাস্তায় প্রবেশ করল গাড়িটা। আবাসিক এলাকা। স্পীড কমে এল, তারপর হঠাৎ ব্রেক করে থেমে দাঁড়াল গাড়ি। বিনা বাক্যব্যয়ে এঞ্জিন চালু রেখেই নেমে গেল ড্রাইভার গাড়ি থেকে। বুট খুলে বের করল কিছু, তারপর পেছনের দরজা খুলে উঠে বসল গাড়ির পেছনের সীটে। রানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পুরানো ধরনের একটা টেনিস র‍্যাকেট রাখছে ড্রাইভার সুটকেস খুলে কয়েকটা কাপড়ের তলায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার ড্রাইভিং সীটে এসে বসল লোকটা। আবার চলতে আরম্ভ করল মার্সিডিস বেঞ্জ।

রানা ভাবছে, এই দল যারাই হোক, মস্ত কোনও মাথা আছে এর পেছনে। অদ্ভুত এদের নেটওঅর্ক। কিন্তু মেয়েটার সাথে এদের কি সম্পর্ক? মায়া ওয়াং কি এদের চাকরি করে? কে সে? হংকং-এ আবার দেখা করবার প্রস্তাবে অমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেন সে? এত গোপনীয়তা কেন? বিপদের সময় কোনও রকম সাহায্য আশা করা যায় মেয়েটির কাছে?

সাংহাই এয়ারপোর্টেই গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। কাস্টমস্ পর্যন্ত সাথে সাথেই থাকল ড্রাইভার। সবার মালই পরীক্ষা করা হচ্ছে। সাথে সাথে চলছে প্রশ্নবান। আগের দুই ভদ্রলোকের চেকিং শেষ হতেই এল রানার পালা।

সুটকেস খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল কাস্টমস্ অফিসার গত-বাঁধা প্রশ্ন।

'নিজস্ব জিনিস ছাড়া আর কিছু আছে?'

'না।'

'মূল্যবান কোনও অলঙ্কার বা আর কিছু?'

'না।'

'কত টাকা সাথে আছে আপনার?'

'পঞ্চাশ ডলার।'

প্রথমেই সুটকেসের এক কোণায় হাত ঢুকিয়ে একটা টেনিস বল বের করল অফিসার।

'এটা কিসের জন্যে? র‍্যাকেটও আছে দেখছি?'

'ওটা টেনিস র‍্যাকেট।'

'তাতে আমার কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু বল কেন?'

'বাড়িতে প্র্যাকটিস করি।'

'আচ্ছা! তা, এত ভারি কেন র‍্যাকেটটা?'

ঘাড় ফেরাতেই চোখ পড়ল রানার মায়া ওয়াং-এর রক্ত-শূন্য মুখের ওপর।

'কত বড় জোয়ানটা তা দেখতে পাচ্ছেন না?' ঠাট্টা করবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু ওর হাসিটা দেখাল কান্নার মত। ব্যাপার কি? লু সান ইনফরম করেনি এদের?

'তা ঠিক। টেনিস খেলোয়াড়ের ফিগারই বটে। কিন্তু একটা কথা ভাবছি, টেনিসে মানুষ যত দুর্বল হয় তত ভারি র‍্যাকেট ব্যবহার করে—যত শক্তিশালী হয় তত হালকা র‍্যাকেট। আপনার বেলায় উল্টো কেন?'

এবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল রানার মুখ। উত্তর খুঁজে পেল না কোনও। এক পা পিছাতেই ধাক্কা লাগল মায়ার সাথে। রানা বলল, 'সরি।'

কাস্টমস্ অফিসার অন্যদিকে চেয়েছিল। রানার মুখ দেখতে পেল না। আনমনে উত্তরটা সে-ই দিয়ে দিল।

'অবশ্য যার যেমন প্র্যাক্টিস্। কি বলেন? কিছু মনে করবেন না এত কথা জিজ্ঞেস করায়। টেনিসে আমিও ইন্টারেস্টেড। আমি সিক্সটি সিক্সের সাংহাই চ্যাম্পিয়ান। উইশ ইয়ু হ্যাপি হলিডে, মি. মাসুদ রানা।'

'থ্যাঙ্কস।'

সুটকেস বন্ধ করে ওপরে সই করে দিল অফিসার। ট্রলিতে চড়ে চলে গেল সেটা লোডিং-এর দিকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রানা। ব্যাটা কি অ্যাকটিং করল? সব জেনেও যদি এত কথা বলে থাকে তাহলে ওকে কাস্টমস থেকে ছাড়িয়ে সিনেমায় নামিয়ে দেয়া উচিত, ভাবল রানা। এগিয়ে চলল সে। পাসপোর্ট দেখাতেই প্যাসেঞ্জারস্ লিস্টে একটা টিক দিয়ে দিল স্মার্ট এক ছোকরা। ডিপারচার লাউঞ্জে গিয়ে বসে পড়ল রানা ঠাণ্ডা নরম গদিতে হেলান দিয়ে।

প্লেনে রানা বসল গিয়ে উইং-এর কাছে ইমার্জেন্সী একজিটের পাশে। অ্যাকসিডেন্ট হলে ওই পথে বাঁচবার আশায় নয়—টিকেটে নম্বর দেয়া আছে। ওটাই ওর জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কর্মকর্তারা। নাকি লু সান? কে জানে!

রানা লক্ষ করেছে, ডিপারচার লাউঞ্জ থেকেই মায়া ওয়াং ছাড়া আরও একজন লোক নজর রাখছে ওর ওপর। চোখে চোখ পড়লেই সরিয়ে নিচ্ছে চোখ, কিন্তু বারবার ঘুরে ফিরে ওর দৃষ্টিটা স্থির হচ্ছে এসে রানার মুখের ওপর। রানাও ভাল করে চিনে রাখল চেহারাটা। কিন্তু কে লোকটা? সি.এস.এস. না আর. এল. টি? চীনাম্যান, সন্দেহ নেই। হাফ হাতা সিল্কের হাওয়াই শার্ট টেট্রন প্যান্টের মধ্যে গোঁজা। লোমহীন মসৃণ দুই বাহুতে থোকা থোকা বলিষ্ঠ পেশী। প্রশস্ত উন্নত বুকের গড়ন শার্টের ওপর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পায়ে একটা নীল হকি কেড্স্। বক্সিং বা কুস্তি চ্যাম্পিয়ান হতে পারে। রানা বুঝে নিয়েছে আইনের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে, লোকটা খুনী। রানার সম্পর্কেও ঠিক এই কথাটাই ভাবছে কিনা ওই লোকটা কে জানে। মুচকে হাসল রানা।

রানার ঠিক পেছনের সীটে এসে বসল লোকটা।

প্রকাণ্ড বোয়িং ছাড়বার আগে টেস্ট করে নিল ক্যাপ্টেন সবকিছু। উইং-ফ্ল্যাপ টেস্টিং ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না রানা। ব্রেক ছেড়ে দিয়ে ধীরে সুস্থে এগোল প্লেনটা টেক-অফ্ রান্ওয়ের দিকে। থেমে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। তারপর সিগন্যাল পেয়েই তীরবেগে ছুটল সামনের দিকে। দুই মিনিটে উঠে গেল কয়েক

হাজার ফুট ওপরে। জানালা দিয়ে সাংহাই নগরীর অট্টালিকাগুলোকে মাটিতে ছড়ানো চিনির দানা মনে হলো। একটা গাড়ির চক্‌চকে পিঠ ঝিক্ করে উঠল রোদ পড়ে। পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে হারিয়ে গেল সাংহাই। নিচে ফসল ভরা মাঠ সবুজ কার্পেটের মত লাগছে। চোদ্দ হাজার ফুট উঠে গেছে ওরা। 'হাউ টু প্লে পোকারে' মনোনিবেশ করল রানা। স্ন্যাক্স্ আর কফি এল, গেল।

দু'ঘণ্টা পর জ্বলে উঠল লাল লেখা:নো স্মোকিং।

তার নিচে লেখা: ফাসেন ইওর সীট বেল্টস্।

পরমুহূর্তেই প্রথমে চীনা এবং পরে ইংরেজি ভাষায় ক্যাপ্টেনের বিরক্তিকর ঘ্যানর ঘ্যানর আরম্ভ হলো—শেষ হলো থ্যাঙ্ক ইউ দিয়ে।

এসে গেছে হংকং।

পাঁচ

আবার সেই কাস্টমস্। কিন্তু এবার অপেক্ষাকৃত ঢিলা। স্ট্যাম্প ছিঁড়ে সাঁটিয়ে দিল অফিসার রানার সুটকেস এবং অ্যাটাচি কেসে দু'একটা গতবাঁধা প্রশ্নের পরই। খুলেও দেখল না সেগুলো। গেটের কাছে দাঁড়ানো ইন্‌স্‌পেক্টর স্ট্যাম্প দেখেই টিক্ মার্ক দিয়ে দিল বাক্সের ওপর সাদা চক দিয়ে।

'মি. মাসুদ রানা?'

খশখশে মোটা কর্কশ গলা শুনতে পেল রানা গেট থেকে বেরিয়েই।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বলেই চোখ তুলে দেখল রানা প্রকাণ্ড চেহারার অসম্ভব মোটা একজন লোক পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মেদবহুল মোটা গলায় আর চিবুকের ঝুলে পড়া মাংসে ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। প্রকাণ্ড পেটটা অসংকোচে হাত খানেক বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে। পা দুটো যেন কোনও রকমে খাড়া রেখেছে পাহাড়-প্রমাণ ধড়টিকে। যেন কাঁধে একটা চাপড় দিলেই বসে পড়বে মাটিতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘামছিল লোকটা। নীল শার্টের বগলের কাছে বিশ্রী হলুদ দাগ পড়েছে ঘামের।

'আপনার জন্যে গাড়ি তৈরি।'

কথাটা কোন মতে উচ্চারণ করে সুটকেসটা প্রায় ছিনিয়ে নিল লোকটা রানার হাত থেকে। তারপর ঘুরেই চলতে আরম্ভ করল। যেন আসল জিনিস পেয়ে গেছে সে, রানাকে ওর আর প্রয়োজন নেই কোনও—রানার দরকার থাকলে আসতে পারে পেছন পেছন, ইচ্ছে করলে না-ও আসতে পারে। হাতে-পায়ে ধরে প্রফেশনাল কণ্ঠ-শিল্পীকে সঙ্গীতানুষ্ঠানে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠান শেষে কর্মকর্তারা যে ব্যবহার করে, অনেকটা সেরকম।

চারদিকে চেয়ে মায়া ওয়াং-এর ছায়াও দেখতে পেল না রানা। সেই জুজুৎসু চ্যাম্পিয়ানও গায়েব। অগত্যা মটু সিং-এর পেছন পেছন একখানা বুইক গাড়ির

সামনে এসে দাঁড়াল সে। লেফট্ হ্যাণ্ড ড্রাইভ। গাড়ির পেছনের সীটে সুটকেস ছুঁড়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে চেপে বসল মোটা লোকটা। সাথে সাথেই গাড়ি কাত হয়ে গেল একদিকে। চোখের ইশারায় পাশের সীটে রানাকে বসার ইঙ্গিত করে ইঞ্জিন চালু করে দিল সে।

উঠে বসল রানা সামনের সীটে। সাংহাই থেকে এত দক্ষিণে এসে রীতিমত গরম বোধ করছে রানা। তাছাড়া লোকটার ব্যবহারে বিরক্তও বোধ করছে যার-পর-নাই। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চলেছি আমরা?'

'যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানেই,' মাতব্বরির চালে বলল মোটা।

চটাস্ করে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করল রানার লোকটার ফোলা গালে। সামলে নিল। শুরুতেই এদের কুনজরে পড়া ঠিক হবে না। এই লোকটাই সি. ওয়াই. লিউঙ কিনা কে জানে। চুপ করে থাকল সে। যতক্ষণ না কাজ উদ্ধার হচ্ছে ছোট হয়ে থাকতে হবে এদের কাছে।

বিপজ্জনক কয়েকটা টার্ন নিয়ে গাড়ি চলল সোজা ভিক্টোরিয়ার দিকে। গিয়ার চেঞ্জের বালাই নেই—অটোমেটিক গিয়ার। মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে পঙ্খীরাজের মত উড়ে চলল লেটেস্ট মডেলের দামী আমেরিকান গাড়ি। রাস্তার দু'পাশে চীনা ভাষায় লেখা অসংখ্য সাইনবোর্ড। তার এক বর্ণও বুঝল না রানা। মাঝে মাঝে আবার ইংরেজি সাইনবোর্ডও আছে। কোকাকোলার বিজ্ঞাপনও দেখল কয়েক জায়গায়। ছোট্ট জায়গার জনসংখ্যা তিরিশ বত্রিশ লাখ—কাজেই সেই পরিমাণই ভিড় রাস্তায়। একবার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিগন্যাল রেড হলে শ তিনেক গাড়ির লাইন লেগে যায়।

একটা প্রকাণ্ড তিরিশতলা স্কাইস্ক্র্যাপারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা জোরে ব্রেক কষে। একজন লোক ছুটে এল গাড়ির পাশে।

'সব ঠিক আছে, লোবো?'

'সব ঠিক,' বলল মোটা। 'বস্ আছে অফিসে?'

'আছে। তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।' দৌড়ে ফিরে গেল সে আবার বাড়ির ভেতর। বোধহয় বস্‌কে আগে থেকে সংবাদ দিতে।

'এসে গেছি,' রানার দিকে চেয়ে বলল লোবো। 'দয়া করে গাত্রোত্থান করুন।'

সুটকেসটা তুলে নিয়ে দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ করল লোবো। ওর পেছন পেছন গিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকল রানা হলঘরে। সিঁড়ির পাশেই এলিভেটরের দরজা। টোয়েনটি সেকেণ্ড ফ্লোরের বাটন টিপে দিল লোবো রানা পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই।

একটা প্রশস্ত করিডরে বেরিয়ে এল ওরা লিফ্‌ট্ থেকে। কার্পেট বিছানো করিডর। কয়েক পা এগিয়ে হাতের ডানধারে একটা বন্ধ ঘর। বেল টিপতেই খুলে গেল দরজা। ওরা ঢুকতে বন্ধ হয়ে গেল আবার। ক্লিক করে তীক্ষ্ণ একটা ধাতব শব্দ হতেই চমকে ফিরে চাইল রানা দরজার দিকে। হাতল নেই কোনও।

একটা প্রকাণ্ড ডেস্কের ওপাশে বসে পাইপ টানছে এক মাঝবয়েসী লোক। ধবধবে সাদা মাথার চুল। বয়স আন্দাজে বেশি পেকে গেছে। সারা মাথাময় এলোমেলো পাখির বাসা হয়ে আছে চুলগুলো। মুখটা ডিমের মত। নিটোল।

অসম্ভব পুরু ঠোঁট দুটোর নিচেরটা ঝুলে গেছে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে। কোটটা খুলে চেয়ারের পেছনে ঝোলানো। ঢুলুঢুলু চোখে রানার দিকে চাইল সে, তারপর উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

ডেস্কটা ঘুরে রানার দিকে এগিয়ে এল লোকটা। লম্বা বেশি হবে না। পাঁচ ফুট তিন কি চার। বাচ্চাদের নেকারবোকারের মত ফুল প্যান্টের কোমর থেকে দুটো ফিতে বেরিয়ে বুকের কাছে গুণচিহ্ন এঁকে কাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেছে পেছনে। সাদা শার্টের কলারের নিচে লাল টাইয়ের কিছুটা বেরিয়ে আছে।

গম্ভীর মুখে চারপাশে এক পাক ঘুরে নিবিষ্ট চিত্তে পরীক্ষা করল সে রানাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। তারপর ডেস্কের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানার মুখোমুখি।

'নতুন লোকদের ভাল মত পরীক্ষা করে দেখতে পছন্দ করি আমি, মি. অরুণ দত্ত।'

'অরুণ দত্ত নয়, এখন থেকে আমি মাসুদ রানা। অরুণ দত্ত মারা গেছে।'

'আচ্ছা বেশ, মাসুদ রানা। যা বলছিলাম, পরীক্ষা করে দেখি আমি। বিশেষ করে সে যদি আপনার মত এমন চমৎকার ফিগারের অধিকারী হয়। প্রথম দর্শনেই যদি কাউকে দেখেই মনে হয় যে আমাদের কাজের জন্যেই তার জন্ম হয়েছে, তাহলে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। এবং পরীক্ষা করা প্রয়োজন। নয় কি?' পাতলা গলা; চড়া পর্দায় কথা বলে লোকটা। ফলে চেহারা না দেখলে নারীকণ্ঠ বলে ভুল করবে লোকে।

বিনয়ের হাসি হাসল রানা।

'সঙ্গে পিস্তল আছে দেখা যাচ্ছে। কি পিস্তল, কত ক্যালিবার?'

চকিতে চাইল রানা লিউঙের ধূর্ত চোখের দিকে। বলল, 'ওয়ালথার পি. পি. কে, থারটি-টু।'

'সাংহাই বলছে আপনি একটা খুন করেছেন। আমি বিশ্বাস করি সে কথা। সে ক্ষমতা যে আপনার আছে তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কাছে নতুন কাজ নেবার ইচ্ছে আছে?'

রানা ভাবল, প্রস্তাবটা বড় বেশি তাড়াতাড়ি এসে গেল না? সাবধান হতে হবে। বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে বলল, 'কি কাজ তার ওপর নির্ভর করবে ইচ্ছেটা—আর কত পাচ্ছি সেটাও দেখতে হবে। আসলে কোনও দলে যোগ দেয়ার আগ্রহ নেই আমার। নিজে উপার্জন করবার ক্ষমতা আছে আমার কোনও দলের সাহায্য ছাড়াই।'

খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল লোকটা মেয়েলী ঢঙে। তারপর বলল, 'ইচ্ছের বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করতে হয়, মি. মাসুদ রানা। সে কথা যাক, পরের কথা পরে।' হঠাৎ ঘুরল সে লোবোর দিকে। 'তুমি হাঁ করে কি শুনছ, লোবো? টেনিস র‍্যাকেটটা ভেঙে মাল বের করে ফেলো।' ডানহাতটা দ্রুত একবার ঝাঁকি দিল লিউঙ। পরমুহূর্তে একটা দুইধারে শান দেয়া ছুরি দেখা গেল ওর হাতে। থ্রোয়িং নাইফ। চ্যাপ্টা বাঁটে স্কচ টেপ জড়ানো। বাহুর সাথে কায়দা করে আটকানো ছিল।

'এক্ষুণি করছি, বস্।'

সুটকেস থেকে র‍্যাকেটটা বের করে নিয়ে এল লোবো ডেস্কের কাছে। দুইহাতে হাতল ধরে জোরে একটা চাপ দিতেই মট করে ভেঙে গেল শেষের অংশটুকু। লিউঙের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মোম বের করল বেশ খানিকটা। তারপর ঝাঁকাতেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এল নস্যির কৌটার মত দেখতে গোল একটা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো। টেবিলের ওপর রাখল সে কৌটোটা।

ততক্ষণে আবার নিজের আসনে ফিরে গেছে সি.ওয়াই. লিউঙ। কৌটোটা খুলে ভেতরের জিনিস দেখল একবার। সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠল ওর কুৎসিত পুরু ঠোঁটে। কৌটোটা বন্ধ করে বলল, 'লোবো, র‍্যাকেট আর সুটকেস সব দূর করো এখন আমার চোখের সামনে থেকে। র‍্যাকেটটা পুড়িয়ে ফেলো, আর সুটকেসটা পাঠিয়ে দাও বিল্টমোর হোটেলে— ওখানে ওর জন্যে রুম বুক করা হয়েছে। বলে দিয়ো যেন ওর ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয় সুটকেস। যাও, কুইক।'

'যাচ্ছি, স্যার।'

সুটকেসটা বন্ধ করে এক হাতে এবং ভাঙা র‍্যাকেটের টুকরো দুটো অন্যহাতে নিয়ে দরজার দিকে চলল লোবো। রানা লক্ষ করল টেবিলের সাথে ফিট করা একটা বোতাম টিপতেই খুলে গেল দরজা। মোটা লোকটা বেরিয়ে যেতেই ছেড়ে দিল লিউঙ বোতামটা। ক্লিক্ করে আবার লেগে গেল হাতল-বিহীন দরজা।

একটা চেয়ার পায়ে বাধিয়ে টেনে এনে সি.ওয়াই. লিউঙের মুখোমুখি বসল রানা। লিউঙের মেয়েলি মুখের দিকে চোখ তুলে হাসল। 'এখন আমার পাওনাটা চুকিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে যেতে পারি।'

এতক্ষণ পলকহীন চোখে লক্ষ করছিল লিউঙ রানার প্রতিটি কার্যকলাপ। এবার চোখটা নামিয়ে কৌটোর দিকে চাইল সে। ওটাকে রেক্সিন মোড়া টেবিলের ওপর শুইয়ে রাস্তা সমান করবার স্টীম-রোলারের মত সামনে-পেছনে করল কিছুক্ষণ ডান হাতের তালু দিয়ে। তারপর আবার চাইল সোজাসুজি রানার দিকে।

'তার আগে দু'একটা কথা সেরে নিই। আপনি নোট জাল করতে পারেন?'

'পারি।'

'নমুনা দেখাতে পারবেন?'

হাসল রানা। বলল, 'এদিকেও ইন্টারেস্ট আছে নাকি? বেশ, দেখুন।'

কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা খাম বের করে সযত্নে খুলল সে, তারপর তিনটে পাঁচ ডলারের নোট বের করে রাখল টেবিলের ওপর। ঠেলে দিল লিউঙের দিকে। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল লিউঙ নোটগুলো। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করল এক এক করে। চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছে নিরাসক্ত রানা।

'বেশ ভালই নকল হয়েছে। ভাল করে লক্ষ না করলে আমার চোখেও ফাঁকি দিতে পারত।' সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল লিউঙ রানার দিকে। 'কিন্তু দোষ আছে একটা।'

'কি দোষ? আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারলে শুধরে নেব।'

'দোষ, মানে, অন্য কোন দোষ নেই। নোটগুলো বেশ ময়লা দেখাচ্ছে।'

'ওটাকে দোষ বলছেন কেন, মশাই? ওটা তো গুণ। ময়লা নোট কেউ সন্দেহ

করে না। নতুন দেখলেই ভাল করে লক্ষ করে।' হাসল রানা।

'তা, কথাটা অবশ্য যুক্তিযুক্তি,' স্বীকার করল লিউঙ। আর মনে মনে এটাও স্বীকার না করে পারল না যে তার সামনে বসা লোকটা একেবারে পাকা জালিয়াত। স্থির করল সে, একে হাতছাড়া করা যাবে না। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল সে।

কিছুক্ষণ উসখুস করে রানা বলল, 'আমার পাওনাটা...'

'আপনি নিজেই তো টাকার গাছ, পাওনার জন্যে এত তাগাদা দিচ্ছেন কেন?'

'গাছে খানিক পানি ঢালতে হবে যে। ঠিক পানি নয়, কেমিকেলস্। নইলে ফল ধরবে না। আমার সব কেমিকেলস্ সাংহাইয়ে নষ্ট করে দিয়ে এসেছি—এখানে আবার কিনতে হবে।'

'পাওয়া যাবে তো সব?' চট্ করে প্রশ্ন করল লিউঙ। রানা সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'তা দৈনিক এরকম নোট কত প্রোডাকশন দিতে পারেন আপনি?'

'উপযুক্ত সহকারী পেলে আন্‌লিমিটেড। একা বড় জোর হাজারটা। ওতেই আমার চলে যায়।'

একটা টেলিফোন এল। রিভলভিং চেয়ারটা ডানধারে ঘুরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চীনা ভাষায় কথা বলল লিউঙ। রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরল আবার রানার দিকে।

'আপনাকে আমরা পুরো টাকাই দেব, মি. অতীশ দত্ত, সরি, মাসুদ রানা। এমন কি বেশিও পেতে পারেন। কিন্তু আমাদের দুই পক্ষেরই নিরাপত্তার জন্যে টাকা দেয়ার একটা কৌশল বের করতে হবে। সোজাসুজি কোনও পেমেন্ট আমরা করব না। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। হঠাৎ অনেক টাকা হাতে পড়লে মানুষ দিশা হারিয়ে ফেলে—জাহির করতে চায়। এখানে ওখানে দিলদরিয়ার মত খরচ আরম্ভ করে। এবং যখনই পুলিস ক্যাঁক করে গর্দান চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে টাকা কোথায় পেলে—উত্তর দিতে পারে না কোনও। বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ। বুঝলাম।'

'কাজেই,' সেই একই পর্দায় একই সুরে বলে চলল লিউঙ, 'আমি এবং আমার উপরওয়ালা পেমেন্টের ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ার। কদাচিত পেমেন্ট করি। আর করলেও অল্প টাকা দিই। কিন্তু আমরা এমন ব্যবস্থা করে দিই যাতে সেই লোক নিজে উপার্জন করে নিতে পারে বাকিটা। আপনার নিজের কথাই ধরুন না। আপনার পকেটে এখন কত আছে?'

'পঞ্চাশ ডলার,' বলল বিস্মিত রানা।

'বেশ। আজ আপনার বহুদিনের পুরানো দোস্ত সি. ওয়াই. লিউঙের সাথে দেখা হয়ে গেল।' একটা আঙুল নিজের বুকে ঠেকাল লিউঙ। 'রীতিমত ভদ্রলোক একজন। হংকং-এর বিশিষ্ট সম্মানিত নাগরিক। সাংহাইয়ে পরিচয় হয়েছিল আমাদের সেই যুদ্ধের সময় ১৯৪৭ সালে। মনে নেই?'

'খুব মনে আছে।'

'সেই সময় একদিন ব্রিজ খেলায় হেরে গিয়ে আমি আপনার কাছে এক হাজার

ডলার দেনা ছিলাম। মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আচ্ছা। আজ যখন দেখা হলো, আমি প্রস্তাব দিলাম টস করে দেখা যাক। হয় ডবল, নয় কুইটস্। এবং আপনি জিতলেন। বুঝেছেন? কাজেই আপনি দু'হাজার ডলার পেয়ে গেলেন আমার কাছ থেকে। এবং আমি একজন বিশিষ্ট নাগরিক আপনার এই গল্প সত্যি বলে স্বীকার করব। এই নিন আপনার দু'হাজার ডলার।'

মোটা একখানা মানিব্যাগ বের করল লিউঙ হিপ পকেট থেকে। বিশটা একশো ডলারের নোট গুণে এগিয়ে দিল রানার দিকে। টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে বুক পকেটে রাখল রানা ওগুলো নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে। বলল, 'বাকিটা?'

'বলছি,' মৃদু হাসল লিউঙ, 'টাকা পেয়ে আপনি আমাকে বললেন রেস খেলতে চান। আমি বললাম, চলুন না, আগামী শুক্রবার হংকং রেস কোর্সে, আমিও যেতে পারি। আপনি রাজি হয়ে গেলেন। তাই না?'

'নিশ্চয়। এক কথায় রাজি!' বলল রানা মৃদু হেসে।

'এবং আপনি ঝোঁকের মাথায় সব টাকা ধরে বসলেন একটা ঘোড়ার ওপর। ভাগ্যক্রমে জিতে গিয়ে অন্ততপক্ষে পাঁচগুণ টাকা পেয়ে গেলেন। ব্যস, আপনার দশ হাজার পূর্ণ হয়ে গেল। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, এত টাকা কোত্থেকে পেয়েছেন, আপনি বলবেন, আইন সঙ্গত উপায়ে রোজগার করেছি। এবং তার প্রমাণও আছে আপনার কাছে।'

'খুব তো সহজ পথ বাতলে দিলেন। কিন্তু সে ঘোড়া যদি হারে, তা হলে?'

'হারবে না।'

চমকে উঠল রানা। আশ্চর্য! এ কোন রাজত্বে এসে পৌছল সে? নরকের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেন সে এখন। পাপের আবর্তের ঠিক মাঝখানে এসে পড়েছে।

'হারবে না?' বোকার মত জিজ্ঞেস করল সে।

'না। হারবে না।'

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে রানা। বলল, 'চমৎকার! আপনারা দেখছি এক মাইল এগিয়ে আছেন আমাদের চেয়ে।'

প্রশংসায় কিছুমাত্র বিচলিত হবার ভাব প্রকাশ পেল না লিউঙের চেহারায়। ঢুলুঢুলু চোখ মেলে চেয়ে থাকল সে রানার দিকে। তারপর যেন একঘেয়েমিতে ভুগছে এমনি কণ্ঠে বলল, 'এক হাজার মাইল।'

'আপনাদের সাথে কাজ করবার সুযোগ পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। আছে আর কিছু কাজ?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল লিউঙ চিন্তান্বিত মুখে। হাতের তালু দিয়ে স্টিমরোলার চালাল মগ্ন চিত্তে। তারপর আবার চোখ তুলল রানার মুখের দিকে।

'থাকতে পারে। এখন পর্যন্ত কোনও ভুল হয়নি আপনার। কাস্টমসের সামনেও বেশ নার্ভের পরিচয় দিয়েছেন। হয়তো কোনও কাজ দিতে পারব। যা বললাম তাই করুন গিয়ে। আগামী মঙ্গল-বুধবার নাগাদ ফোন করবেন আমাকে। কাজ থাকলে বলব তখন। কিন্তু যা বললাম তার যদি বরখেলাফ করেন, তবে আপনার পেমেন্টের

ব্যাপারে আর কোনও দায়িত্বই থাকবে না আমাদের। বুঝেছেন? এবার আমার টেলিফোন নম্বরটা টুকে নিন: ৯০৩৩২১-২৩। ঠিক আছে? এবার আসল কথাটা লিখে নিন। গোপন রাখবেন—নইলে আপনার মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।' মাথা নেড়ে নিজের কথাটাকেই যেন সমর্থন করল লিউঙ। 'লিখুন, শুক্রবার; সপ্তম দৌড়; সাড়ে তিন বছরের ঘোড়াদের জন্যে দু'মাইলের পাল্লা। জানালা বন্ধ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে জমা দেবেন টাকা। ও. কে?'

'ও. কে।'

'মস্তবড় সাদা ঘোড়া। ঘাড়ের কেশর আর চারটে খুরের কাছে কালো। জিততে হলে ওই ঘোড়ায় খেলবেন। নাম: হোয়াইট অ্যাঞ্জেল।'

ছয়

পৌনে দুটোর সময় বেরিয়ে এল রানা রাস্তায়। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। লিউঙের এয়ার-কণ্ডিশনড্ ঘর থেকে বেরিয়ে অসম্ভব গরম লাগল ওর। হাঁটতে থাকল সে ফুটপাথ ধরে বাড়িগুলোর ছায়ায় ছায়ায়। ট্যাক্সি পেলেই উঠে পড়বে। কিন্তু পাশ দিয়ে কয়েকটা খালি ট্যাক্সি চলে গেল, তবু উঠল না সে। চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে হাঁটতেই থাকল। বেশ খানিকদূর হাঁটার পর যখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারল কেউ অনুসরণ করছে না ওকে, তখন একটাকে ডেকে বলল, 'বিল্টমোর হোটেল।'

পিছনের সীটে বসে দোকান-পাট দেখতে দেখতে চলেছে রানা, হঠাৎ চোখ পড়ল রিয়ার ভিউ মিররের ওপর। দেখল ওই আয়না দিয়ে ওকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল ড্রাইভার, চাইতেই চোখ ফিরিয়ে নিল। এক সেকেণ্ড মাত্র দেখল রানা ড্রাইভারের চোখ। কিন্তু এক সেকেণ্ডই যথেষ্ট। চিনে ফেলল রানা ওকে। এখন জামা কাপড় বদলে এসেছে, কিন্তু এই লোকটাই এসেছে আজ সাংহাই থেকে হংকং ওর সাথে একই প্লেনে। সেই জুজুৎসু চ্যাম্পিয়ান।

তাহলে ওদের সম্পূর্ণ আওতার মধ্যেই রয়েছে সে এখনও। ওর প্রতিটি কার্যকলাপের ওপর লক্ষ রাখছে ওরা। সন্দেহমুক্ত করতে পারেনি সে নিজেকে।

আর একটি বারও আয়নাটার দিকে চাইল না রানা। যেন কিছুই বোঝেনি, কিছুই টের পায়নি এমনি ভাব নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল নির্বিকার মুখে। হোটেলে পৌঁছতেই নেমে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল ড্রাইভার। ভাড়ার সাথে বকশিসও দিল রানা, মাথা নুইয়ে সালাম করে গাড়িতে উঠে বসল ড্রাইভার। কিন্তু রানা হোটেলে না ঢোকা পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকল গেটের সামনে। রানা চোখের আড়াল হতেই পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে গিয়ে একটা বাড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকল মিনিট বিশেক। তারপর গাড়ি থেকে নেমে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার।

প্রকাণ্ড হোটেল। পরিচয় দিতেই কী-বোর্ডের হুক থেকে খুলে ওর কামরার

চাবি এগিয়ে দিল সুশ্রী এক যুবতী। চাবির সাথে একটা কালো চাকতিতে সাদা কালি দিয়ে লেখা:

৩য় ফ্লোর
রূম ৩১০

আধ ঘন্টার মধ্যে খাবার পাঠাবার আদেশ দিয়ে উঠে এল রানা চার তলায়। চাবি ঘোরাতেই খুলে গেল দরজা।

চমৎকার কার্পেট বিছানো প্রশস্ত ঘর। সাথে অ্যাটাচড় বাথ। ডাবল্‌বেড খাটের মাথার কাছে ছোট একটা টেবিলের ওপর টেলিফোন, দামী একখানা অল-ওয়েভ ট্র্যানজিসটার সেট আর একটা ফুলদানিতে প্লাস্টিকের ফুল সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। বিছানায় শুয়েই হাত বাড়িয়ে ধরা যায়। ড্রেসিং টেবিলের আয়না সাদা নাইলন নেটে ঢাকা। আলনার পাশে একটা তাকের ওপর তোবড়ানো সুটকেসটা সযত্নে রাখা। ঘরের এক কোণে একটা রাইটিং টেবিল—তার ওপর একটা সুদৃশ্য টেবিল ল্যাম্প। একটা চেয়ার রাখা সে টেবিলের সামনে। এক কোণে একটা আরাম কেদারা। সব কিছুই টিপ-টপ, রুচি সম্মত। রানা আন্দাজ করল এই কামরার দৈনিক ভাড়া কমপক্ষে পঁচাত্তর হংকং-ডলার হবে।

এয়ার কুলারের 'হাই কূল' লেখা বোতামটা টিপে দিল রানা। তারপর টাওয়েল আর সাবানটা বের করে নিয়ে ছুটল বাথরুমের দিকে।

মিনিট দশেক শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করল সে—তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে খাবারের জন্যে বেল বাজিয়ে দিল। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ইজি চেয়ারে শুয়ে আজকের সমস্ত ঘটনাগুলো মনে মনে খুঁটিয়ে দেখল রানা। না, ভুল হয়নি কোথাও।

এঁটো বাসন পেয়ালা এবং মোটা বকশিস নিয়ে খুশি মনে চলে গেল বেয়ারা। দরজা বন্ধ করে বিছানায় উঠতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় খুট করে শব্দ হলো একটা। সটান ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখল রানা দেয়ালের গায়ে দরজা খুলে গেছে একটা। পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝের দরজা। খোলা দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লিউ ফু-চুং। চায়নিজ সিক্রেট সার্ভিসের ক্যালকাটা-চীফ।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা। ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে চুপ করবার ইঙ্গিত করল ফু-চুং। পা টিপে এগিয়ে এসে ট্র্যানজিসটারটা খুলল সে। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতেই ভেসে এল চীনা সঙ্গীত। ভলিউম বাড়িয়ে দিল ওটার। তারপর ইঙ্গিতে খাটের পায়ের দিকে দেখিয়ে টেনে নিয়ে গেল রানাকে বাথরুমের মধ্যে।

'মাইক্রোফোন আছে, গর্দভ!' চাপা গলায় বলল ফু-চুং। ইঙ্গিতেই বুঝে নিয়েছিল রানা। কিন্তু হোটেলের মধ্যে মাইক্রোফোন কেন? তবে কি…? উত্তরটা এল ফু-চুং-এর কাছ থেকেই, 'লিউঙের হোটেল। প্রত্যেক ঘরেই মাইক্রোফোন আছে—রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে ঘরের মধ্যেকার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটা কথাবার্তা।'

'কিন্তু তুই হঠাৎ কোত্থেকে, দোস্ত?'

'ঢাকা থেকে তুই আসছিস জানতে পেরেই হংকং-এর উদ্দেশে ফ্লাই করবার জন্যে আর্জেন্ট সিগন্যাল এসেছিল আমার কাছে। এখানে পৌঁছে সমস্ত ঘটনা

শুনলাম। ওদের ধারণা তিনটে অ্যাসাইনমেন্টে আমরা যখন এক সাথে কাজ করে বিজয়ী হয়েছি, তখন এটাতেও হব। কাজেই যেখানে মাসুদ রানা, যাও সেখানে লিউ ফু-চুং। কাল এখানে পৌঁছেই সারাদিনে যতটা পেরেছি খবরাখবর জোগাড় করে ফেলেছি। আজ এখানে তোর জন্যে কত নম্বর রুম রিজার্ভ করা হয়েছে জানতে পেরে পাশের ঘরটা ভাড়া নিয়েছি। এখন তোর খবর বল্।'

'শোন। আমাকে দু'হাজার ডলার দিয়েছে লিউঙ। বাকিটা পাব রেস খেলে।'

'রেস খেলে?'

'হ্যাঁ। আগামী শুক্রবার, সপ্তম দৌড়—সাড়ে তিন বছরের ঘোড়াদের জন্যে দুই মাইলের পাল্লা। ঘোড়ার নাম হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। কথাটা কাউকে বললে জিভ কেটে নেবে বলেছে।'

'ফ্যান্টাস্টিক!'

'একদম রিয়েলিস্টিক বাছা, বাস্তব সত্য। এরা কাজ নিয়ে ইয়ার্কি মারে না, কথারও বরখেলাপ করে না। বিশেষ করে আমার মত একজন প্রসপেকটিভ জালিয়াতকে এই ক'টা টাকার জন্যে ঠকিয়ে হাতছাড়া করবে না।'

'জালিয়াত?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল ফু-চুং রানার দিকে।

নোট জালের কথা ভেঙে বলতেই হেসে ফেলল ফু-চুং। বলল, 'কিন্তু জাল নোট পেলি কোথায়, শালা?'

'দুত্তোর জাল নোট। আসল নোট দেখিয়ে বলেছি জাল করেছি। ব্যাটা একেবারে তাজ্জব বনে গেছে। ভাবছে কোটিপতি হয়ে যাবে আমাকে হাতে রাখলে। যাই হোক, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের নিশ্চিত জয়টা ভণ্ডুল করে দিতে পারবি?'

'কি করে?'

'নিশ্চয়ই হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের কোনও গোলমাল আছে। নইলে এত কনফিডেন্স পেল কোথায় ওরা? তুই চেষ্টা করে দেখ এর গুমরটা ফাঁক করতে পারিস কিনা। তারপর জকিকে ভয় দেখিয়ে বা ঘুসের লোভ দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে পারবি হয়তো। আমি নিজেই করতাম, কিন্তু শালারা ছায়ার মত অনুসরণ করছে আমাকে।'

'বুঝলাম। কিন্তু হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের জয় ঠেকালে তোর কি সুবিধে?'

'বলছি। অনেক কথা, সংক্ষেপে বলছি। আমাকে নতুন কাজ দিতে রাজি হয়েছে লিউঙ। কিন্তু ভাল মত যাচাই না করে দলে নেবে না। রেসখেলার ব্যাপারটা নিয়ে ক'দিন খুব ব্যস্ত আছে ওরা—রেসের তিন-চার দিন পর আমাকে ফোন করতে বলেছে। তার মানে এর মধ্যে ভাল করে খোঁজ নেবে আমার সম্পর্কে। মাইক্রোফোনেই যদি ধরা পড়ে যাই তো চুকে গেল, প্রয়োজন হলে অরুণ দত্তের বাড়িতেও লোক পাঠাবে। সাচ্চা যখন নই, ধরা পড়বই। আমাকে বিশ্বাস করেনি ওরা। বোধহয় কাউকেই করে না। এখন আমি চাইছি আমাদের কাজ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ওদের ব্যস্ত রাখতে। হোয়াইট অ্যাঞ্জেল না জিতলে কয়েক লাখ ডলার ক্ষতি হয়ে যাবে ওদের, তখন আমার খোঁজ-খবর স্থগিত রেখে এর কারণ অনুসন্ধানেই জোর দেবে। আমিও সেই সুযোগে চাপ দেব টাকার

জন্যে—নতুন কাজের জন্যে। চারপাশের পানিটা ঘোলা করে ফেলতে না পারলে পরিষ্কার দেখে ফেলবে ওরা আমাকে। ঘোলা অবস্থায় যতদূর পারা যায় ডুব সাঁতার দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করব ওদের এলাকার মধ্যে।'

'শয়তানী বুদ্ধি তো বেশ ভাল খেলে তোর মাথায় রে! যাই হোক আমি চেষ্টা করব জকিকে কাবু করতে। যা হয় জানাব তোকে কাল।'

'ঘরের মধ্যে বয়-বেয়ারা থাকতেই আবার মড়মড় করে সেঁদিয়ে পড়িস না।'

আঙুল দিয়ে দরজার গায়ে একটা ছিদ্র দেখাল ফু-চুং। বলল, 'অনেক খেটে বানিয়েছি ওটা। বয়-বেয়ারা থাকতে ঢুকে পড়বার ভয় নেই।'

চোখ টিপল লিউ ফু-চুং দুষ্টামির হাসি হেসে, তারপর পা টিপে চলে গেল পাশের ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল রানা। রেডিও বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল সে নরম বিছানায়।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে সারা হংকং-ময় লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াল রানা ট্যাক্সি করে। কাউলুন থেকে মাইল চারেক দূরে কার্লটন হোটেলে বসে কাউলুনের বিখ্যাত বাতি আর হংকং জেটির চমৎকার দৃশ্য আর সেই সাথে পিকিং-ডাকের অপূর্ব ঘ্রাণ ও স্বাদ উপভোগ করতে করতে ডিনার সেরে নিল। হোটেলে যখন ফিরে এল তখন ঘড়িতে বাজে রাত এগারোটা।

আঠার মত পিছু লেগে ছিল জুজুৎসু চ্যাম্পিয়ান। এতক্ষণে ছুটি পেয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো সে মনে মনে রানার বাপ-মা তুলে গালি দিতে দিতে।

সাত

'আমার মা-ই আমার সর্বনাশটা করল, রানা। আর আমি করলাম তোমার। কিন্তু এছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না, বিশ্বাস করো।'

সাগরের দিকে মুখ করে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছে ওরা ডিনার শেষ করে। চমৎকার করে ছাঁটা ঝাউগাছ আড়াল করেছে ওদেরকে রিপালস্ বে হোটেলের আলোকোজ্জ্বল আঙিনার মত্ত কোলাহল থেকে। দূরে জেলেদের কয়েকটা সাম্পান থেকে আলো পড়েছে সাগরের জলে। ভূতুড়ে লাগছে দেখতে।

গতকালই হোটেলটা একপাক ঘুরে দেখে গেছে মাসুদ রানা। বিল্টমোর হোটেল থেকে দ্বীপের অপর দিকে এই রিপালস্ বে হোটেল ঝাড়া আধঘণ্টার পথ। হোটেলের সামনে চমৎকার একটা বাগান, ঝোপঝাড়ের আড়ালে সুন্দর বসবার ব্যবস্থা; সরু পীচঢালা রাস্তা চলে গেছে সাগরের তীর পর্যন্ত, পথের শেষে চলনসই একটা বীচ—সবই দেখেছে সে ঘুরে ফিরে। প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছে মনে মনে। আজ তাই ঘণ্টাখানেক আগে মায়া ওয়াং পৌঁছুতেই তাকে নিয়ে সোজা চলে এসেছে হোটেলের শেষ প্রান্তের নিচু প্রাচীর ঘেঁষা নির্জন টেবিলটায়। গেটের কাছে কোকাকোলার বোতল হাতে দাঁড়ানো একজন চীনা লোকের সাথে রানার চোখে চোখে কি ইঙ্গিত বিনিময় হলো জানতেও পারেনি মায়া ওয়াং। বেল বাজাতেই বয়

এসেছে, মায়ার পছন্দ মত ডিনার দিয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়ার পর সরিয়ে নিয়ে গেছে এঁটো বাসনপত্র। সে-ও প্রায় আধঘন্টার কথা।

এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক রানা শুনেছে মায়ার অবিশ্বাস্য কাহিনী।

আবার গ্লাস দুটো ভর্তি করে দিল রানা। ছিপি বন্ধ করে নামিয়ে রাখল কোকের বোতলটা ঘাসের ওপর। তারপর বলল, 'আমার কি ক্ষতি করেছ জানি না। সেটা পরে শুনব। কিন্তু তোমার মা যখন আর নেই তখন চ্যাঙের সাথে সম্পর্কও নেই তোমার। তুমি কোন্ অপরাধে শুধু শুধু ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওদের হয়ে কাজ করবে?

'চ্যাঙ-এর গুপ্তধনের সন্ধান জানার অপরাধে।'

'তুমি কি করে জেনেছিলে?'

'আমার মা-র কাছে। ঘরে যে মাইক্রোফোন ছিল সে কথা মা-র জানা ছিল না। মা-তো আত্মহত্যা করেই খালাস—আমি বাঁধা পড়লাম চ্যাঙ-এর হাতে চিরকালের জন্যে।'

'তোমার মা কি জেনেশুনেই বিয়ে করেছিলেন দস্যু চ্যাঙকে?'

'না। আমাদের আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ যাচ্ছিল। বাবা মারা যাবার পর জানা গেল প্রচুর টাকা ঋণ রেখে গেছেন তিনি। বন্ধকীর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যেতেই উচ্ছেদ করে দেয়া হলো আমাদের বাড়ি থেকে সাত দিনের নোটিশে। থাকা খাওয়ার ঠিক ছিল না। এমনি সময় চ্যাঙ মাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। হংকং-এর সেরা সুন্দরী ছিলেন তিনি। চ্যাঙের টাকা পয়সার মোহে পড়ে রাজি হয়ে গেলেন আমার মা। আমরা চলে গেলাম ম্যাকাও। পরে ধীরে ধীরে জানা গেল কতবড় ভুল হয়ে গেছে। পৃথিবীর হীনতম দস্যুদল রেড লাইটনিং টং-এর দলপতির স্ত্রী তখন তিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। ধীরে-সুস্থে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে এক-একটা। মায়া ওয়াং-এর কথাগুলো আবার মনে মনে উল্টে পাল্টে দেখল সে। কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে তার কাছে সবকিছু। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই মেয়েটি তাকে এসব কথা বলছে কেন? নিজের পরিচয়, দলের পরিচয় এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার—গুপ্তধনের সন্ধান দিল কেন মেয়েটি এমন অসঙ্কোচে একজন প্রায়-অপরিচিত লোকের কাছে? কি প্ল্যান ঘুরছে ওর মাথায়? কোনও ট্র্যাপ? কিছুই বুঝতে পারে না সে।

'চ্যাঙ-এর ছেলেমেয়ে নেই?'

'না। আমিই ওর সমস্ত সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, ওর এতো সম্পত্তির মালিক হওয়ার চেয়ে মুক্ত স্বাধীন পথের ভিখারি হলেও আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করতাম।'

'বুঝলাম। কিন্তু তুমি পুলিসের সাহায্য নাওনি কেন, মায়া?'

'পুলিস?' হাসল মায়া ওয়াং। 'পুলিস কি করবে? চ্যাঙের বিরুদ্ধে একটা আঙুল উঁচু করতেও সাহস পাবে না পুলিস।'

'তুমি সাংহাইয়ে গিয়ে আর না ফিরলেই পারো?'

'তোমাকে তো বলেছি, সাংহাইয়ে প্রতিটা মুহূর্ত আমার ওপর নজর রাখা হয়। সাইলেন্সার ফিট করা একটা পিস্তল চব্বিশ ঘণ্টা নির্নিমেষে চেয়ে থাকে আমার

হৃৎপিণ্ডের দিকে। একটু এদিক-ওদিক হলে বিনাদ্বিধায় খুন করা হবে আমাকে। নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রাণধারণের অনুমতি দিয়েছে আমাকে চ্যাঙ। কিন্তু তার হুকুম ছাড়া কারও সঙ্গে মেলামেশা তো দূরের কথা, কথা বলাও বারণ। চারদিক দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমাকে। মৃত্যু ছাড়া মুক্তি নেই। কতদিন মায়ের মত আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। আমি বড় ভীতু, মি. রানা। তুমি বুঝতে পারবে না কত কাঙালের মত মুক্তি চাই আমি।'

টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল মায়ার কোলের ওপর। সবুজ একটা চিয়োং সাম পরেছে মায়া। চিক চিক করছে গালের ওপর অশ্রুর ধারা। রানার কাছে অতুলনীয় মনে হলো ওকে। ওর একটা হাত তুলে নিল সে নিজের হাতে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দু'জন। একটা রুমাল বের করে আলগোছে মুছে নিল মায়া গাল দুটো। রানা বলল, 'একটা কথা সত্যি করে বলবে?'

'কি কথা? বলব।'

'আমাকে এসব কথা কেন বললে?'

'এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না বলে। কাউকে না কাউকে আমার বলতে হতই। এত লোক থাকতে তোমার ওপরই নির্ভর করতে চাইলাম কেন তা বলতে পারব না। হয়তো তোমার মধ্যে কিছু দেখতে পেয়েছি আমি, কিংবা হয়তো তোমার অমন বলিষ্ঠ ঋজু স্বাস্থ্য আর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাই এর কারণ হতে পারে। কিন্তু আসল কথা, আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে গিয়ে এই কাজটা করেছি।'

মৃদু হাসল রানা।

'কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা জানলে ভয়ে শুকিয়ে যাবে তোমার মুখ। তবু স্পষ্টই বলব সব কথা। আমি জানি একবার সব কথা বলতে পারলে আর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না তুমি। পৃথিবীতে মাত্র দু'জন মানুষ জানত এই গুপ্তধনের কথা—চ্যাঙ আর আমি। এখন তুমিও জেনেছ। আমার কথামত আমাকে যদি এই দলের খপ্পর থেকে বের করে না আন, তাহলে আমার সাথে সাথে তোমাকেও বরণ করে নিতে হবে নিশ্চিত মৃত্যু। আমাকে সাহায্য করতেই হবে তোমার।'

মুচকে হাসল রানা। 'ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছ আমাকে?'

'তা যদি মনে করো, তাহলে তাই। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো, পৃথিবীতে এত লোক থাকতে তোমাকেই বেছে নিলাম কেন? আর তো কাউকে বলতে সাহস পাইনি। তোমার ওপরই কেবল নির্ভর করা যায় মনে করলাম কেন?'

'কেন?'

'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, রানা।'

এমনি সময় কাছেই একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাওয়া গেল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। এক লাফে দেয়ালের পাশে চলে এল সে। দেখল পেছন থেকে সাপটে ধরেছে ফু-চুং সেই জুজুৎসু চ্যাম্পিয়নকে। হাত ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে লোকটা। হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রের বলে ছিট্‌কে পড়ল ফু-চুং কয়েক হাত দূরে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আবার, কিন্তু দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে সে।

বেড়ালের মত নিঃশব্দ অথচ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল জুজুৎসু ব্ল্যাক-বেল্ট হোল্ডার। দাও চালনোর মত করে বিদ্যুৎগতিতে ডান হাতটা চালাল একবার ফু-চুং-এর বাঁ কাঁধের ওপর। ঝুলে পড়ল ফু-চুং-এর বাম হাত। এবার আবার মারল সে আঙুলগুলো সটান সোজা রেখে সেই মার ফু-চুং-এর পেটের ওপর। অবর্ণনীয় ব্যথায় কুঁকড়ে গেল ওর দেহ...বেঁকে গেল সামনের দিকে। হাঁটু দিয়ে থুতনিতে একটা আপার কাট্ মারতেই চিত হয়ে পড়ে গেল ফু-চুং মাটিতে। কোমর থেকে টান দিয়ে একটা ছোরা বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা ওর বুকের ওপর।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল তিন চার সেকেণ্ডের'মধ্যে। এক লাফে দেয়াল টপকে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। ছুটে গিয়ে দড়াম করে লাথি মারল লোকটার শিরদাঁড়ার ওপর। রানা বুঝে নিয়েছে এ-লোক জুজুৎসুর ব্ল্যাক-বেল্ট নয়, পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম নিরস্ত্র-যুদ্ধ 'কারাতে'র ওস্তাদ। একে কোনও রকম সুযোগ দেয়া চলবে না। স্টীলের পাত বসানো জুতোর প্রচণ্ড লাথি শিরদাঁড়ায় পড়তেই বাঁকা হয়ে গেল লোকটার দেহ পিছন দিকে, ছুরিটা পড়ে গিয়েছে হাত থেকে খসে। নির্মম ভাবে আবার লাথি চালাল রানা ওর পাঁজর লক্ষ্য করে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। ফু-চুং-এর বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল সে মাটিতে। কিন্তু আশ্চর্য! এই আঘাতের পরেও বাঁ পায়ে সে একটা প্রচণ্ড লাথি মারল রানার উরুর ওপর, আর সেই সাথে ডান পা দিয়ে রানার হাঁটুর নিচে বাধিয়ে টান দিল সামনের দিকে। মুহূর্তে ধরাশায়ী হলো রানাও। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল লোকটা। রানাও উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জন দু'জনের ওপর। রানা জানে ওর অল্পবিস্তর জুজুৎসু জ্ঞান টিকবে না লোকটার কাছে। ফু-চুং পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। কাজেই এখন একমাত্র ভরসা ওর হেভি ওয়েট বক্সিং—কুস্তির কায়দায় পারবে না এর সাথে। কাছে আসতেই পোক্ত দুই বিরাশি সিক্কা চালিয়ে দিল সে নাক বরাবর। কুস্তিগীর বোধহয় এমন আচমকা এই বিলেতী জিনিস আশা করেনি। দুই হাতে মুখ ঢাকল সে। সাথে সাথেই তলপেট বরাবর পড়ল রানার ফাইনাল লাথি। বিচিত্র এক টুকরো শব্দ বেরোল ওর মুখ থেকে তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে মুখ থুবড়ে।

ফু-চুং ততক্ষণে উঠে বসেছে। ওর পকেট থেকে নাইলনের কর্ড বের করে হাত-পা বেঁধে ফেলল রানা লোকটার। নিজের রুমালটা ঢুকিয়ে দিল ওর মুখের ভেতর, ফু-চুং-এর রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেলল মুখটা বাইরে থেকে। তারপর ফিরে এল ফু-চুং-এর কাছে।

'কেমন বোধ করছিস এখন?'

জবাব দিল না ফু-চুং কোনও। ঘুরে বসে গলগল করে বমি করে ফেলল। রানা ধরে থাকল ওকে। বেশ খানিকটা বমি হয়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়াল ফু-চুং। মাটি থেকে ছুরিটা তুলে পকেটে রাখল।

'এখন ঠিক হয়ে গেছে। ব্যাটা আড়ি পেতে তোদের সব কথা শুনছিল। তুই যা, আমি এখন লাশটা নিয়ে কেটে পড়ি।'

'মরেনি। জানটা আছে। শুধু পিটিয়ে লাশ করেছি। নিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু দোস্ত, সাবধান, একা নিতে চেষ্টা করিস না আবার। তোর লোকজন

কোথায়?'

'আছে, এক্ষুণি এসে পড়বে। তুই যা এখন, আমি সব ব্যবস্থা করে নেব।' বাম কাঁধটা ডলতে থাকল ফু-চুং।

হোটেলের দিকে ফিরে রানা দেখতে পেল দেয়ালের ওপর দিয়ে একজোড়া ভয়ার্ত বিস্ফারিত চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে। মায়া ওয়াং। রানার পিছু পিছু সে-ও এসে দাঁড়িয়েছিল দেয়ালের ধারে।

দেয়াল টপকে এদিকে চলে এল রানা। বলল, 'এই হারামজাদা আমার পেছনে লেগেছিল ক'দিন ধরে আঠার মত। ছাড়াতে পারছিলাম না কিছুতেই। তাই এ ব্যবস্থা করেছিলাম।'

'বমি করল, ওই লোকটা কে?' তীব্র উৎকণ্ঠা মায়ার কণ্ঠে।

'ও আমার এক বন্ধু।'

'ল্যাং ফু-কে নিয়ে এখন কি করবে?'

'ল্যাং ফু? ওর নাম ল্যাং ফু নাকি? তা যে ফু-ই হোক, বাছাধনকে ক'দিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে।'

'এই ঘটনাটা টং-এর কেউ জানতে পারলে তোমার কি অবস্থা হবে জানো?'

'জানি। চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে লিউঙ। তোমাকেও তাই করবে।'

'এখন উপায়? জানাজানি তো হবেই।'

'হবে না। লোকটাকে বেমালুম গায়েব করে দিচ্ছি। আমি করলাম, না অন্য কেউ করল কে জানে। ওসব নিয়ে তুমি ভেব না। আমার ওপর নির্ভর করতে চেয়েছ, নিশ্চিন্তে নির্ভর করো। মরলে দু'জনে এক সাথে মরব।'

'তুমি লিউঙকে চেনো না, তাই এমন হালকাভাবে কথাগুলো বলতে পারলে। কিছুতেই তুমি ওর কাছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারবে না। ধরা পড়বেই।'

'কি করবে লিউঙ? সাধারণ একটা...'

'সাধারণ? তোমার দেখছি অনেক কিছু জানতে বাকি আছে। চ্যাঙ-এর ডানহাত। টং-এর সমস্ত জুয়ার ভার ওর ওপর। সাঙ্ঘাতিক মানুষ! ওর সাথে হ্যাণ্ডশেক করলে লোকে হাতের আঙুল গুণে দেখে সব ঠিক আছে, না এক-আধটা খোয়া গেছে। আর তুমি বলছ সাধারণ। হংকং-এ সবাই ওকে যমের মত...'

'আর ভয় দেখিয়ো না, মায়া। এমনিতেই তোমার ব্ল্যাকমেইলিং-এর কথা শুনে ভয়ে আধমরা হয়ে আছি—এখন আবার লিউঙের ভয় দেখালে ঠিক হার্টফেল করব। তারচেয়ে বলো কি ধরনের সাহায্য আশা করছ তুমি আমার কাছ থেকে। একটা বিরাট দস্যুদলের বিরুদ্ধে কি করতে পারি আমি?'

'তার আমি কি জানি? সে ভার তোমার ওপর। ল্যাঙ ফু-কে আজ বন্দী না করলে আমাদের কি অবস্থা হত তাই ভাবছি। ভাগ্যিস তুমি বুদ্ধি করে...যাক, যে করে হোক আমরা দু'জন পালিয়ে যাব এখান থেকে। পালিয়ে গিয়ে আমরা...'

বেধে গেল মায়ার মুখের কথা। লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল নিচে।

'বলো, বলো,' রানা বলল, 'পালিয়ে গিয়ে আমরা? কি করব বলো?'

'যাহ্, তুমি ভারি পাজি। তোমার যা খুশি করবে, আবার কি?'

'যদি কোথাও ফেলে পালাই? তাহলে?' দুষ্টামির হাসি হাসল রানা।

'তা তোমরা পারো। পুরুষ মানুষকে দিয়ে বিশ্বাস কি? কিন্তু ভুলে যেয়ো না; আমি আর দশটা মেয়ের মত নই।'

'বেশ, বেশ। কিন্তু যদি সত্যিই কখনও তোমার হাত ধরে বলি, চলো, যাবে?'

'বলেই দেখো না যাই কিনা। বিশ্বাস করো, রানা, তোমার ভরসাতেই সাহস পেয়েছি আজ চ্যাঙের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার। তুমি নেবে আমাকে সাথে? সত্যিই?'

মৃদু চাপ দিল রানা মায়ার হাতে। চোখে চোখে চেয়ে রইল দু'জন। মৃদু হাসি ফুটে উঠল মায়ার অধরে। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়েই চমকে উঠল। 'এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে, রানা। দুই ঘণ্টা পার হয়ে গেছে টেরই পাইনি।'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মায়া। রানাও উঠল চেয়ার ছেড়ে। হঠাৎ দুই হাতে গলা সাপটে ধরল মায়া রানার। ওর বুকে কপাল ঘষল। হেসে ফেলল রানা।

'হাসছ কেন?' জিজ্ঞেস করল সে রানাকে ছেড়ে দিয়ে।

'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। তাই।'

উত্তপ্ত রক্তিম হয়ে উঠল মায়ার গাল।

'ছেলেমানুষ না কচু। আমার বয়স কত জানো?'

'না তো!'

'পঁচিশ!' চোখ পাকিয়ে বলল মায়া—যেন অনেক বয়স। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জোর করে যেন বিচ্ছিন্ন করল মায়া নিজেকে রানার মোহজাল থেকে, হাঁটতে থাকল গেটের দিকে।

রানাকে পিছু পিছু আসতে দেখে বলল, 'তুমি থাকো। গোপনে এসেছি, গোপনেই যেতে হবে আমাকে। আধ ঘণ্টা পরে এসো তুমি। ভাল কথা, বিল্টমোরে তোমার পাশের ঘরেই কিন্তু আছি আমি।'

চলে গেল মায়া ওয়াং।

আট

আধ ঘণ্টা আগেই গিয়ে পৌঁছল মাসুদ রানা।

চারদিকে তুমুল হৈ-চৈ হট্টগোল। পৃথিবীর সর্বত্র যেমন হয়, এখানেও তেমনি। মাথার ওপর কড়া রোদ্দুর, ঘামের দুর্গন্ধ, নেশার ঝোঁকে সর্বস্ব খোয়ানো পরাজিত মুখ। বেশির ভাগ খেলোয়াড়ের হাতেই একটা করে পুস্তিকা। দৌড় আরম্ভ হতে যাচ্ছে—এইমাত্র মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট শেষ হলো।

আশা-নিরাশা, লোভ আর ক্ষোভের আলোছায়া দেখল রানা জুয়াড়ীদের চোখেমুখে, আর আবার একবার মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করল সে জুয়া খেলাকে; এবং সাধারণ মানুষের লোভকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে যারা ব্যবহার করে তাদেরকে।

হংকং রেসকোর্স হচ্ছে পৃথিবীর সেরা রেসকোর্সগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিটা দৌড়ে বিশ-পঁচিশ লক্ষ ডলার খেলা হচ্ছে। ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশনে

প্রতিটা ঘোড়ার গতিবিধি দেখা হচ্ছে—প্রয়োজনমত ছবি তুলে নেয়া হচ্ছে মুভি ক্যামেরায়। অত্যাধুনিক চলমান সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে চারতলা দর্শকের গ্যালারিতে ওঠানামার জন্যে।

দোতলা-তিনতলায় বসবার সুযোগ পায়নি রানা। চারতলার খোলা ছাতে জায়গা নিতে হয়েছে ওকে। সোজা চাঁদির ওপর উত্তাপ বর্ষণ করছেন সূর্যদেব নির্বিকার চিত্তে। বিশ মিনিটেই কোকাকোলার জন্যে প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করে উঠল রানার। বাচ্চা ফেরিওয়ালাকে ডেকে ঠাণ্ডা এক বোতল কোক খেলো সে, তারপর আবার মন দিল রেস খেলায়। হাতের পুস্তিকা উল্টেপাল্টে দেখল সপ্তম দৌড়ের ফোরকাস্ট। ৩ নম্বর আর ৫ নম্বরের মধ্যেই হবে আসল প্রতিযোগিতা। ৩ নম্বর হচ্ছে থাণ্ডার স্পীড, ৫ নম্বর ব্ল্যাক টর্পেডো। হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের সম্ভাবনা লিখেছে পনেরো ভাগের এক ভাগ—অর্থাৎ লাস্ট। ওর নম্বর হচ্ছে ১১—জকি, টিয়েন হং।

রানা ভাবছে, ফু-চুং কি সত্যি সত্যিই পারল হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের জকিকে রাজি করাতে? গতকাল সন্ধ্যায় শেষ দেখা হয়েছে ওর সাথে। হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের পুরো ইতিহাস জোগাড় করে ফেলেছে সে। যে ঘোড়া আজ দৌড়াচ্ছে আসলে সেটা হোয়াইট অ্যাঞ্জেলই নয়। আসল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল এ-বছর বেশ অনেকগুলো বাজিতে দৌড়েছে। একটাতেও প্রথম তিনের মধ্যে থাকতে পারেনি। ওটাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে ক'দিন আগে।

'তা কি করে হয়? জোচ্চুরি এড়াবার জন্যে ঘোড়াগুলোর ঠোঁটে টাট্টু করা থাকে না?' রানা জিজ্ঞেস করেছিল।

'আরে দূর, ওসব এখন পুরানো হয়ে গেছে। নতুন চামড়া লাগিয়ে তার ওপর হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের মার্ক দেয়া হয়ে গেছে ছ'মাস আগে। একে পিকা পেপার বলে। খুরগুলো এবং আরও দু'একটা জায়গা অদল বদল করা হয়েছে দক্ষ হাতে। বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছে ব্যাটারা। এক বছর ধরে তৈরি হয়েছে ওরা আগামী কালকের এই সপ্তম ঘোড়দৌড়ের জন্যে। সব টাকা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে এই এক দৌড়েই। আমার মনে হয় কমপক্ষে পনেরো গুণ তো হবেই।'

'এত খবর পেলি কোত্থেকে?'

'ঘুষ।'

'তারপর? এখন কি করবি? জকির সাথে দেখা করেছিস?'

'সব সেরে তবেই এসেছি। আবার যাচ্ছি এখন। কিন্তু দোস্ত দু'হাজার ডলার অগ্রিম দেব কথা দিয়েছি—টাকা যে নেই আমার কাছে।'

'কুছ পরোয়া নেই। আমি দিচ্ছি,' রানা বলল। 'কিন্তু টাকা নিয়ে ও আবার বিট্রে করবে না তো?'

'আরে না। সোজা আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়েছি। বলেছি, হোয়াইট অ্যাঞ্জেল যদি জেতে তাহলে আর রক্ষা নেই। স্টুয়ার্ডদের কাছে গিয়ে সব খুলে বলব। ফলে ওর জকিগিরি ঘুচে যাবে জন্মের মত। একটা মাত্র পথ খোলা আছে ওর। আমার কথামত কাজ করলে এই জোচ্চুরির কথা তো বেমালুম চেপে যাবই, তার ওপর নগদ পাঁচ হাজার ডলার দেব। বুদ্ধিমান লোক। বিনা বাক্যব্যয়ে এক

কথায় রাজি হয়ে গেছে টিয়েন হং। আজ দু'হাজার দেব বলেছি, বাকিটা পাবে ঘোড়দৌড়ের পর।'

'কিভাবে হারাবে হোয়াইট অ্যাঞ্জেলকে?' জিজ্ঞেস করেছিল রানা।

'ওদের মাথায় একশো এক বুদ্ধি। ও-ই বাতলে দিল। হোয়াইট অ্যাঞ্জেল জিতবে ঠিকই, নইলে ওর গর্দান নিয়ে নেবে লিউঙ, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফাউল করে ডিস্‌কোয়ালিফাইড হয়ে যাবে। এমন কায়দা করে করবে সেটা যে কেউ বুঝবে না ও এটা ইচ্ছে করে করেছে—সবাই এটাকে ব্যাড লাক মনে করবে। দুই কুলই রক্ষা পাচ্ছে টিয়েন হং-এর।

কিন্তু সত্যিই কি কথামত কাজ করবে টিয়েন হং?

প্রতি সিকি মাইল অন্তর অন্তর উঁচু পোস্টের ওপর অটোমেটিক ক্যামেরা ফিট করা আছে। সেগুলোর দিকে চাইল রানা। কোন ক্যামেরাটা হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের ফাউল দেখতে পাবে আন্দাজ করবার চেষ্টা করল সে। উত্তেজনা অনুভব করল ভেতর ভেতর। সপ্তম দৌড়ের অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। রানার অল্প দূরেই স্টার্টিং পয়েন্ট। পুরো এক চক্কর দিয়ে এক ফারলং গেলেই উইনিং পোস্ট। পরিষ্কার দেখতে পাবে রানা সবকিছু।

একে একে স্টার্টিং গেটের কাছে জমা হতে থাকল ঘোড়াগুলো। ৩ নম্বর আর ৫ নম্বর এসে দাঁড়াতেই হর্ষধ্বনি উঠল দর্শকের মধ্যে থেকে। ১১ নম্বর দর্শকদের কোনও রকম সহানুভূতি পেল না। আবার অ্যানাউন্সমেন্ট হলো লাউড স্পীকারে।

ডিং করে বেল বেজে উঠতেই হৈ-হৈ করে উঠল দর্শকবৃন্দ। চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘোড়াগুলো বিদ্যুৎগতিতে। নম্বর দেখতে পেল না রানা, গগলস পরা জকিদের মধ্যে চিনতেও পারল না টিয়েন হং-কে। ক্ষিপ্রবেগ আর ধূলির ঝড় গোলমাল করে দিল সবকিছু।

একটু দূরে যেতেই ধূলি সরে যাওয়ায় পরিষ্কার দেখা গেল, আগে ভাগেই রয়েছে ১১ নম্বর। প্রথম বাঁক নিচ্ছে ঘোড়াগুলো। ৮ নম্বর ঘোড়াটা দৌড়াচ্ছে সবচেয়ে আগে। নতুন ঘোড়া। বাইরে থেকে এসেছে। ব্যাপার কি? এটাই কি শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করবে নাকি? না। ৩ নম্বর ধরে ফেলল ওকে, তারপর এগিয়ে গেল ওকে ছাড়িয়ে। ৫ নম্বরও এবার ছাড়িয়ে যাচ্ছে ৮ কে। এইবার হোয়াইট অ্যাঞ্জেলও ধরে ফেলল। এই চারটে ঘোড়াই সবচেয়ে আগে আছে—বাকিগুলো বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল সবচেয়ে আগে আছে থাণ্ডার স্পীড, তারপর ব্ল্যাক টর্পেডো, তারপর সমান সমান দৌড়াচ্ছে ৮ নম্বর আর হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। তৃতীয় বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল এগিয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক টর্পেডো ক্রমেই থাণ্ডার স্পীডের কাছাকাছি, আর ব্ল্যাক টর্পেডোর ঠিক পেছন পেছন চলছে হোয়াট অ্যাঞ্জেল ৮ নম্বরকে ছাড়িয়ে এসে। আবার ঘুরতেই দেখল রানা আগে আগে ছুটছে ব্ল্যাক টর্পেডো, দ্বিতীয় হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। থাণ্ডার পিছিয়ে পড়েছে এক লেংথ। হৈ-হৈ করছে মাঠের সমস্ত লোক। হোয়াইট অ্যাঞ্জেল এগিয়ে আসছে এইবার। এই সমান সমান হয়ে গেল। শেষ বাঁকটা ঘুরছে এখন। শ্বাস রুদ্ধ করে বসে রইল রানা। এইবার, এইবার! হোয়াইট অ্যাঞ্জেল এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রেলিং-এর দিকে ছিল ব্ল্যাক টর্পেডো, তাই সোজা হতেই দেখা গেল আবার সমান

হয়ে গেছে ওরা। অগণিত লোক চিৎকার করে ব্ল্যাক টর্পেডোকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। এবার রানা পরিষ্কার উপলব্ধি করল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল এখন এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি করে সরে আসছে ব্ল্যাক টর্পেডোর দিকে। মাথাটা নিচু করে রেখেছে টিয়েন হং ঘোড়ার গলার ওপাশে, যেন না দেখে ঘটছে ঘটনাটা। ধীরে ধীরে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে গেল দুটো ঘোড়া। হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের মাথা দিয়ে আড়াল হয়ে গেল ব্ল্যাক টর্পেডোর মাথা। তারপর হাত দুয়েক এগিয়ে গেল হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের মাথা। ক্ষমতা থাকলেও আর আগে বাড়তে পারবে না ব্ল্যাক টর্পেডো।

রানার সমস্ত মাংসপেশী টান হয়ে গেল উত্তেজনায়। বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে যেন কেউ। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল ব্ল্যাক টর্পেডোর জকি। মাঠের সবাই বুঝল এটা ফাউলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পরমুহূর্তেই হোয়াইট অ্যাঞ্জেল ব্ল্যাক টর্পেডোকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে। তীব্র কণ্ঠে আপত্তির ঝড় উঠল দর্শকবৃন্দের মধ্যে। হুলস্থূল কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল দর্শক গ্যালারিতে।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সচেতন হয়ে পেশীগুলো ঢিল করল রানা। ওর সামনে দিয়ে উইনিং পোস্ট ছাড়িয়ে চলে গেল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। দশগজ পেছনে ব্ল্যাক টর্পেডো এবং প্রায় সাথে সাথেই থাণ্ডার স্পীড।

ভালই অভিনয় করেছে টিয়েন হং। ঘোড়াগুলো সব ফিরে এল। বুক ফুলিয়ে আগে ভাগে আসছে সে। দর্শকের গালাগালি যেন ও মনে করছে প্রশংসা। মাথার টুপি খুলে আকর্ণ হাসি হেসে প্রত্যাভিবাদন করছে সে দর্শকদের।

মস্ত বোর্ডে রেজাল্ট উঠেছিল। হঠাৎ দর্শকদের হর্ষধ্বনিতে চেয়ে দেখল রানা হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের পাশে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'অবজেক্‌শন্‌', লাউড স্পীকারে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আপনাদের টিকেট নষ্ট করবেন না। এই প্রতিযোগিতায় হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের নামে আপত্তি তোলা হয়েছে ব্ল্যাক টর্পেডোর পক্ষ থেকে। আবার বলছি—আপনারা আপনাদের টিকেট নষ্ট করে ফেলবেন না।'

রুমাল বের করে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে নিয়ে সোজা হয়ে বসল রানা।

অল্পক্ষণ পরেই মাইকে ঘোষণা করা হলো:

'একটি ঘোষণা। এই প্রতিযোগিতায় হোয়াইট অ্যাঞ্জেলকে ডিসকোয়া-লিফায়েড বলে রায় দেয়া হলো। ব্ল্যাক টর্পেডোকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। আবার বলছি…'

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল রানা একটা বাজে।

ফিরে এল সে হোটেলে।

অপারেটার জানাল সি.ওয়াই. লিউঙের লাইন এনগেজড। রানা বুঝল, এতদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করবার পর সোনার ফসল ঘরে তুলতে না পেরে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লিউঙ। হওয়াটাই স্বাভাবিক। বহু টাকা ঢেলেছিল ওরা এই দৌড়ের পেছনে।

অপারেটারকে বারবার চেষ্টা করবার অনুরোধ করে বাথরুমের দরজা খোলা

রেখেই স্নান সেরে নিল রানা। ক্লেদসিক্ত দেহ থেকে সূর্যের উত্তাপ আর রেসকোর্সের ধুলো দূর করে আরাম করে বসল সে ইজি চেয়ারে। ঢিল করে দিল সমস্ত শরীর।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে আগাগোড়া সবটা ব্যাপার চিন্তা করে দেখল কোথাও ভুল-ভ্রান্তি বা খুঁত রয়ে গেছে কিনা। মনে পড়ল গতকাল ম্যাকাও যাবার আগে মায়া ওয়াং-এর আকুল মিনতি—সাবধানে থেকো রানা। তোমাকে হারাতে চাই না আমি। তোমার জন্যে যে কতখানি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি তা তুমি বুঝবে না। এরা গোক্ষুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সাবধানে থেকো, প্লীজ।'

ফোন বেজে উঠল।

'মি. মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'লাইনে থাকুন। এক্ষুণি ৯০৩২১-২৩ দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।'

দুই সেকেণ্ড পরেই লিউঙের মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'ইয়েস। কে বলছেন?'

'মাসুদ রানা।'

'বলুন?'

'হোয়াইট অ্যাঞ্জেল ধরে হেরেছি।'

'জানি। জকি হারামীপনা করেছে। তা, এখন কি বলছেন?'

'টাকা,' নরম গলায় বলল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ হয়ে গেল লিউঙ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আবার প্রথম থেকে শুরু করা যাক। পাঁচটার মধ্যে দু'হাজার ডলার পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। সেই যে টস করে জিতেছিলেন আপনি আমার কাছে—মনে আছে?'

'আছে।'

'দুপুরে ঘরে থাকুন আজ। পাঁচটার মধ্যে লোক যাবে আপনার কাছে টাকা আর লিখিত ইনস্ট্রাকশন নিয়ে।'

ফোন ছেড়ে দিল লিউঙ। রানা নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল সে। তাহলে এবার কি আরেক রকম জুয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে? আইন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রতিটা কাজে, প্রতিটা পদক্ষেপে এরা যে যত্ন আর সাবধানতা অবলম্বন করছে, তাতে রানা বিস্মিত না হয়ে পারল না। ঠিকই তো। খালি হাতে হংকং এসে জুয়া ছাড়া আর কোন্ উপায়ে দশ হাজার ডলার উপার্জন করতে পারত সে? এবারে কেমন জুয়া খেলতে হবে কে জানে!

খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে বিশ্রাম নিল রানা ঘণ্টা দুয়েক। ঘুম এল না চোখে। মনের মধ্যে ভিড় করে এল রাজ্যের যত আবোল-তাবোল চিন্তা। ফু চুং-এর কাছে কয়েকটা কথা গোপন করে কি সে ঠিক করল? ওরা চায়, রানা এই স্মাগলিং দলটাকে শুধু চিনিয়ে দিক—বাকি কাজ ওরা করবে। রেড লাইটনিং টং-এর কথা, চ্যাঙের কথা, লিউঙের আসল পরিচয় ইত্যাদি ওদের জানালেই রানার ছুটি। কিন্তু ওরা যে পুরো দলটার সঙ্গে নির্দোষ মায়া ওয়াং-কেও ধ্বংস করে দেবে বিনা

দ্বিধায়। তাছাড়া এমন সুন্দর খেলা জমিয়ে তুলে হঠাৎ কেটে পড়তেও সায় দিচ্ছে না ওর মন। সবটাই যদি না দেখতে পেল, প্রাণের ভয়ে যদি পিছিয়েই পড়ল সে, তাহলে মজাটা আর থাকল কোথায়? চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস চায় না ওর কোনও বিপদ হোক। মায়ার কাছ থেকে শোনা তথ্যগুলো ওদের জানালেই ওরা তৎক্ষণাৎ ওকে সরিয়ে ফেলবে হংকং থেকে। তাই কোনও কথা বলেনি ওদের। তাড়াহুড়োর কি আছে, ধীরে সুস্থে বললেই হবে পরে।

কিন্তু আশ্চর্য! জলজ্যান্ত একজন লোক দু'দিন ধরে গায়েব হয়ে গেল বেমালুম, অথচ এদের ভাবে-ভঙ্গিতে কোনও পরিবর্তন এল না কেন? অন্তত লিউঙ তো জানত, রানার পেছনেই লাগানো হয়েছিল ল্যাং-ফু-কে। ওর অন্তর্ধানের ব্যাপারে রানার হাত আছে এটা ধরে নেয়াই তো স্বাভাবিক। অথচ কারও কাছে কোনও আভাস পেল না সে এই দু'দিন। যেন ল্যাঙ ফু বলে কেউ ছিলই না কোনদিন। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকল রানার কাছে। তাছাড়া ওর পরিচয়ের সত্যতা যাচাইয়ে ওরা কতদূর এগোল সে জানে না। আর ক'দিন সে এভাবে টিকতে পারবে?

মাথা ঝাড়া দিয়ে এসব চিন্তা দূর করে দিল রানা। প্রতীক্ষা করতে ওর বড় খারাপ লাগে। সময় কাটতে চায় না কিছুতেই। জামা-কাপড় পরে নিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করল সে ঘরের মধ্যে। ভাবল, যে করে হোক আগে ম্যাকাও পৌঁছতে হবে। ছুটিয়ে আনতে হবে মায়াকে চ্যাঙ-এর কবজা থেকে, তারপর এই দস্যুদলের যা হয় হোক। কফির অর্ডার দিল সে, তা-ও কারও দেখা নেই।

শেষ চুমুক দিয়ে কফির কাপটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রাখতেই ঠকঠক করে শব্দ হলো দরজায়।

'ভেতরে আসুন।'

দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল লোবো। ঘামে ভিজে সপসপ করছে গায়ের শার্ট। একটা নোংরা তোয়ালের মত রুমাল বের করে মোটা ঘাড়ে ও মুখে বুলাল সে। ঠাণ্ডা ঘরে ইজি চেয়ারে মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রানাকে বসে থাকতে দেখে বোধহয় পিত্তি জ্বলে গেল ওর। রানা বসতে বলল, কিন্তু বসল না। প্রথম দিন থেকেই অসম্ভব বিরক্ত হয়ে আছে রানা লোকটার ওপর। বিরক্তি চেপে ভদ্রতা করে বলল, 'বসুন না। কফি দিতে বলি এক কাপ?'

'পরের পয়সায় খুব আতিথেয়তা হচ্ছে, না?' গর্জে উঠল লোবো।

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল রানার। বলল, 'তা কফি না হয় না-ই খেলেন। বসতে আপত্তি কি? মোটা মানুষ—ঘেমে তো একেবারে—'

'শাট্ আপ!' চিৎকার করে উঠল লোবো। তারপর সাঁ করে এক তোড়া নোট ছুঁড়ে মারল রানার দিকে। খপ করে ধরে না ফেললে সোজা এসে লাগত রানার নাকে-মুখে।

আর সহ্য করতে পারল না রানা। দ্বিগুণ জোরে ছুঁড়ে মারল সেটা মোটার মুখের ওপর। চটাস করে চপেটাঘাতের মত শব্দ তুলে লাগল গিয়ে নোটগুলো লোবোর গালে।

এটা যে সম্ভব, কল্পনাও করতে পারেনি লোবো। অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে

রইল সে রানার দিকে।

তারপর লাফিয়ে এগিয়ে এল বাঘের মত। রানা উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। কিন্তু প্রস্তুত হয়ে নেবার আগেই বাঘের থাবা এসে পড়ল চুলের ওপর। বাম হাতে মুঠি করে ধরল লোবো রানার চুল, ডান হাতে তুলল তিনমণী কিল।

দুইহাতে মাথার ওপর মুঠিটা ধরল রানা শক্ত করে, তারপর ঝপ করে বসে পড়ল। এটা জুজুৎসু ক্লাসে প্রথম দিনেই শেখানো হয়েছিল ওদের। অতি সাধারণ অথচ কার্যকরী একটা কৌশল।

হাতটা বেকায়দা মতন মচকে যেতেই 'আউ' করে একটা শব্দ বেরোল মোটার মুখ থেকে। ওর পকেট থেকে আলগোছে রিভলভারটা বের করে ফেলে দিল রানা ঘরের এক কোণে। তাজ্জব বনে গেল লোবো। এত বড় স্পর্ধা! উঠে দাঁড়িয়ে হাসছে আবার!

এবার ভীমের গদার মত ডান হাতটা চালাল সে। তার আগেই গোটা দুই ঘুসি চালিয়ে দিয়েছে রানা ওর নাক বরাবর। দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক থেকে। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না সে। দড়াম করে কাঁধের ওপর ডান হাতটা এসে পড়তেই পড়ে গেল রানা মাটিতে। হাঁটুটা ভাঁজ করে রানার বুকের ওপর লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল লোবো—ঝটাং করে মোক্ষম মার মারল রানা। নইলে গুঁড়ো হয়ে যেত ওর বুকের পাঁজর। জায়গা মত লাথিটা লাগিয়ে দিয়েই কার্পেট বিছানো মেঝের ওপর এক গড়ান দিয়ে সরে গেল রানা।

অসহ্য বেদনায় নীল হয়ে গেল লোবোর মুখটা। দুই হাত দুই উরুর মাঝখানে চেপে ধরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে মেঝেতে। মুখ হাঁ করে শ্বাস নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে কপালে।

'যেমন আছ তেমনি পড়ে থাকো। নইলে এক লাথি দিয়ে নাকটা সমান করে দেব,' বলল রানা।

ইচ্ছে করলে প্রাণ ভরে কিলিয়ে হাতের সুখ মিটিয়ে নিতে পারত রানা ওর ওপর। কিন্তু তা না করে মাটি থেকে রাবারব্যাণ্ডে জড়ানো নোটের তোড়াটা তুলে নিল সে। একটা শাদা কাগজ দেখা যাচ্ছে নোটের সাথে। টেনে বার করল ওটা। খাম একটা।

'খবরদার!'

চমকে চাইল রানা দরজার দিকে। নিঃশব্দে দু'জন পিস্তলধারী লোক এসে কখন ঢুকেছে ঘরের মধ্যে টের পায়নি সে। দুটো পিস্তলই ওর দিকে ধরা।

'এক্ষুণি লিউঙকে ফোন করা দরকার। যদি বাধা দাও তাহলে বিপদে পড়বে, বাছা,' যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে বলল রানা।

একবার রানার হাতে ধরা নোটের বাণ্ডিল আর খামটার দিকে, আর একবার আহত লোবোর দিকে চেয়ে পিস্তলের ইশারায় ফোন করতে বলল একজন।

রিসিভার তুলে নিয়ে লিউঙের নম্বর দিল রানা অপারেটারকে। এতক্ষণে বোধহয় লাইনটা হালকা হয়েছে—দুই সেকেণ্ড পরই কানেকশন পাওয়া গেল লিউঙের।

'ইয়েস। কে বলছেন?'

'মাসুদ রানা।'

'আবার কি?'

'আপনি যে মোটা গর্দভটাকে পাঠিয়েছেন, তাকে কি টাকাটা আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবার আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন?'

'না। কেন, কি হয়েছে?'

'কি আবার হবে? ওর প্রকাণ্ড ধড়টা এখন মেঝেয় পড়ে হাঁসফাঁস করছে।'

'আপনি মেরেছেন ওকে? হোটেল কর্তৃপক্ষ কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে?' উত্তেজিত শোনা গেল লিউঙের কণ্ঠস্বর। শেষের কথাটা প্রায় আপন মনেই উচ্চারণ করল সে।

'হ্যাঁ, মেরেছি।' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'আর আপনার হোটেল কর্তৃপক্ষও জেগেই আছে। দু'জন গুণ্ডা চেহারার লোক ঘরে ঢুকে পিস্তল ধরে আছে আমার দিকে। অতিথিদের আপ্যায়নের এই কি রীতি নাকি আপনাদের?'

পনেরো সেকেণ্ড চুপ করে থাকল লিউঙ। তারপর ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনার কপাল মন্দ। লোবো আর ল্যাংফু বাল্যবন্ধু। এদের কারও সঙ্গে লাগা মানেই মৃত্যু। অযাচিত এই বীরত্ব প্রদর্শন আপনার পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সব কথা না শুনে কিছু বলা যাচ্ছে না। টেলিফোনটা দিন লোবোকে।'

ইশারা করতেই উঠে দাঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফোনের কাছে এগিয়ে এল লোবো। অনর্গল চীনা ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। এদিকে পিস্তলধারীদের একজন ঘরের কোণ থেকে তুলে নিল লোবোর রিভলভারটা। তারপরই ওর চোখ পড়ল পাশের ঘরের দরজায় ফুটোর দিকে। দ্রুতপায়ে গিয়ে দাঁড়াল সে দরজার সামনে। বল্টু খুলে ধাক্কা দিল। বন্ধ ওদিক থেকে। ভাল করে পরীক্ষা করল ছিদ্রটা। তারপর লোবোর কানে কানে কি যেন বলল। কথা থামিয়ে মোটা ঘাড় ফিরিয়ে ছিদ্রটা দেখল একবার লোবো, একবার চাইল রানার দিকে, তারপর সংবাদটা দিল লিউঙ-কে।

কিছুক্ষণ রিসিভার ধরে চুপচাপ শুনল লোবো লিউঙের মেয়েলী কণ্ঠস্বর। তারপরই রিসিভারটা দিল রানার কাছে।

'ছিদ্রটা কে করেছে?' খনখনে লিউঙের গলা।

'জানি না। প্রথম দিন থেকেই দেখছি ওটা।'

'সাবধান থাকবেন, আমরা খুব শিগগিরই বিপদ আশঙ্কা করছি। খুব সাবধান!'

ছেড়ে দিল লিউঙ টেলিফোন। রানা ঘুরে দেখল পিস্তলধারী দুজন অদৃশ্য হয়ে গেছে ঘর থেকে লোবোর নীরব ইঙ্গিতে। চিঠিটা পড়ে ফেরত দিল রানা মোটার হাতে। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোবো। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'দিন ঘনিয়ে এসেছে তোমার। প্রস্তুত থেকো। শীঘ্রি শোধ নেব আমি।'

কোনও জবাব দিল না রানা। কাল্পনিক সিগারেটে একটা টান দিয়ে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়াটা ছাড়ল মোটার দিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল লোবো।

রানার মাথার মধ্যে চলছে দ্রুত চিন্তা। এখনও সময় আছে। কেটে পড়বে?

নিজেকে এভাবে বিপদের মধ্যে জড়াচ্ছে কেন সে? পরিষ্কার বোঝা গেল ল্যাংফুর রহস্যজনক অন্তর্ধানের ব্যাপারে যে ওর হাত আছে তাতে ওদের সন্দেহমাত্র নেই। তার ওপর আজ বেরোল দরজার ছিদ্র। ফু-চুং-ও জড়িয়ে পড়ল ওদের সন্দেহ-জালে। সতর্ক হয়ে যাবে ওরা, এখন যে-কোনও মুহূর্তে আঘাত হানবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকবে। সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল না তো?

দুইবার পড়ে মুখস্থ করে ফেলা চিঠিটার কিছু কিছু অংশ মনে মনে আওড়াল রানা: হোটেল সিসিল—ম্যাকাও। রাত আটটায় স্টীমার। আগামীকাল রাত সাড়ে আটটায় হোটেল সিসিলের সপ্তম তলায় বারের সঙ্গে লাগা 'ব্ল্যাকজ্যাক' টেবিলে পরপর চারবার খেলতে হবে। প্রতিবার দু'হাজার করে।

সবশেষে লাল কালিতে লেখা ছিল: পত্রবাহকের হাতেই চিঠিটা ফেরত দেবেন। নিজ স্বার্থেই গোপনীয়তা রক্ষা করবেন—কারণ, ভুল আমরা পছন্দ করি না।

রানার মনের মধ্যে একটা অ্যালার্ম বেল বেজে উঠল। ম্যাকাও কেন? টাকা পেমেন্টের জন্যে কি হংকং-এ কোনও কায়দা পেল না ওরা? ওদের ঘাঁটিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কি উদ্দেশ্যে? মায়াকে পাঠিয়ে দিয়েছে গতকালই। মায়া কি ওদের টোপ হিসেবে কাজ করছে? ওরা কি সবকিছু টের পেয়ে গেল এরই মধ্যে?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানবার কোনও উপায় নেই। দুটো মাত্র পথ খোলা আছে রানার সামনে। মায়াকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে যাওয়া—অথবা মায়াকে সন্দেহ করে পিছিয়ে আসা।

এগিয়ে যাবে সে—স্থির করল রানা।

নয়

ফটো ইলেকট্রিক সেল পরিচালিত কাঁচের দরজা আপনা-আপনি খুলে গেল রানা এগোতেই! ধীর পায়ে ঢুকল রানা হোটেল সিসিলে। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা পেছনে। ওর মনে হলো সিংহের খাঁচায় ঢুকে পড়েছে যেন ও।

হংকং-কে দুর্বৃত্তের স্বর্গ বলা হলেও তাও খানিকটা খোলামেলা। ম্যাকাও পৌঁছে রানা অনুভব করল চারদিকটা যেন বন্ধ। পঙ্কিল পাপের দুর্গন্ধ উঠে দূষিত হয়ে গেছে যেন এখানকার আকাশ বাতাস। বুক ভরে শ্বাস নেয়া যায় না। কেমন যেন অসহায় বোধ করল ও। বুঝল, এখানকার একমাত্র আইন হচ্ছে ওয়েবলি অ্যাণ্ড স্কট্। পারবে সে টিকে থাকতে?

থ্রী ডেকার এস. এস. টাকশিং স্টীমারে উঠেই রানা একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেয়েছিল এক সেকেণ্ডের জন্যে। লোবো। সে-ও চলেছে ম্যাকাও রানার সাথে সাথে। পুরো তিনঘণ্টা লাগল এই চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে—এর মধ্যে লোবোর ছায়াও দেখতে পাওয়া যায়নি আর।

প্রকাণ্ড নয়তলা হোটেল সিসিলের হোটেল হচ্ছে কেবল অষ্টম ও নবম তলাটা।

বাকি সমস্ত তলায় বিভিন্ন রকমের দেশী-বিদেশী জুয়ার ব্যবস্থা।

প্রত্যেকটা তলা ঘুরে দেখতে দেখতে ওপরে উঠতে থাকল রানা সিঁড়ি বেয়ে। লিফট অবশ্য আছে একটা। কিন্তু প্রায়ই অকেজো হয়ে থাকে। সপ্তম তলায় খেলা হয় সব চাইতে উঁচু স্টেকে। ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে স্টেক একতলা, দোতলা, তেতলা করে।

হঠাৎ চমকে উঠল রানা। মায়া না? কোণের একটা টেবিলে একজন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে বসে আছে মায়া ওয়াং। রানার দিকে একবার চেয়ে যেন চিনতেই পারেনি এমনি ভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিল মায়া। কিন্তু বৃদ্ধ চীনা স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ করছে তাকে। নিশ্চয়ই চ্যাঙ। এ লোক চ্যাঙ ছাড়া আর কেউ নয়। লাফিয়ে উঠল রানার বুকের ভেতর এক ঝলক রক্ত।

যেন সম্মোহন করছে এমনি তীক্ষ্ণ চ্যাঙের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে রানার চোখে। রানাও পাল্টা লক্ষ করল ওকে আপাদমস্তক। মাথা ভর্তি টাক, শক্ত সমর্থ চেহারা, চিবুকে অল্প খানিকটা কাঁচা পাকা দাড়ি, শানটুং সিল্কের শার্ট আর গ্যাবারডিনের ঢোলা স্যুট পরনে, কান দুটো অস্বাভাবিক বড়। মনের মধ্যে গেঁথে নিল রানা ছবিটা, তারপর ঘুরে হাঁটতে থাকল সিঁড়ির দিকে। পুরো ঘরটা পেরিয়ে তারপর অষ্টম তলার সিঁড়ি। কারণটা সহজেই বুঝতে পারল রানা। হোটেলের গেস্টকে ঢুকতে বা বেরোতে হলে প্রত্যেকটা জুয়ার টেবিলের পাশ দিয়ে আসতে-যেতে হবে। ফলে তার পক্ষে লোভ সংবরণ করা শক্ত হবে।

সিঁড়ির কাছে গিয়ে একবার ফিরে চাইল রানা। দেখল, এখনও তেমনি ভাবে তার দিকে চেয়ে আছে দস্যু চ্যাঙ।

অষ্টম তলায় দুই কামরার একখানা চমৎকার স্যুইট রিজার্ভ করা আছে রানার জন্যে। সব ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর। একটা বেডরুম, একটা লিভিংরুম—পুরু কার্পেটে মোড়া। বেডরুমের সঙ্গে সমুদ্রের দিকে মুখ করা ব্যালকনি আছে একটা। রানা ভাবল, একটু অতিরিক্ত খাতির হয়ে যাচ্ছে না? তবে কি ওরা কিছুই সন্দেহ করেনি? নাকি খাঁচায় ঢুকিয়ে নিয়ে খেলা দেখতে চাইছে?

স্টীমারেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছিল রানা। ঘড়িতে বাজছে রাত বারোটা। শহরটা ঘুরে ফিরে সব গলি ঘুঁচি চিনে নেয়ার প্রবল ইচ্ছেটাকে চাঁটি মেরে দাবিয়ে দিল সে। আর কোনও কাজ নয়, বিশ্রাম নিতে হবে আজ।

ঠিক রাত দুটোর সময় কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। মনে হলো কেউ যেন টোকা দিল দরজায়। স্লীপিং গাউন পরা ছিল। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে খালি পায়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। কান পাতল দরজার গায়ে। একটা মৃদু পদশব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। নিঃশব্দে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল রানা—মাথাটা বের করল বাইরে। দেখল করিডর ধরে হেঁটে চলে যাচ্ছে একটি মেয়ে, খালি পায়ে। চিনতে পারল সে—মায়া ওয়াং। হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলছে একটা ঢোলা নাইট গাউন।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল। তারপর চলল মায়ার পিছুপিছু। একবার পিছু ফিরে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল মায়া। তারপর ডানধারে মোড় নিল। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল রানা জনশূন্য করিডর

ধরে। এবার নবম তলার সিঁড়ি ধরে উঠছে মায়া। রানাও উঠে এল পেছন পেছন। নবম তলার একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মায়া ওয়াং, ওর পিঠের কাছে রানা।

আর একবার পেছন ফিরে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল মায়া। রানা মাথা ঝাঁকাল। ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দরজায় তালা দিয়ে দিল মায়া। হাত ধরে টেনে নিয়ে এল রানাকে ঘরের মাঝখানে।

রানা বলল, 'কি ব্যাপার, মায়া? হঠাৎ এত রাতে?'

'চুপ! আস্তে কথা বলো!' চাপা গলায় বলল মায়া। 'পাশের ঘরেই চ্যাঙ। তোমার পাশের ঘরে লোবো। তুমি তো নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছ, এদিকে আমি ছটফট করে মরছি। না জানি কি বিপদ ঝুলছে তোমার মাথার ওপর। ওরা তোমাকে সন্দেহ করেছে, রানা।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আগে বসো, তারপর বলছি।'

রানাকে ইতস্তত করতে দেখে বলল, 'নিশ্চিন্তে বসো। এই ঘরে মাইক্রোফোন নেই, আস্তে কথা বললে টের পাবে না কেউ।'

একটা সোফায় বসে পড়ল রানা, তার পাশে বসল মায়া ওয়াং। গায়ে সুগন্ধি সাবানের সুবাস। পাশের শোবার ঘর থেকে হালকা আলো এসে পড়েছে এ ঘরে। সুন্দর লাগছে রানার মায়াকে।

'তুমি জানলে কি করে?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'আজ সন্ধের পর থেকেই খুব বিচলিত দেখছিলাম চ্যাঙকে। তুমি যখন এলে তখন ভালমত তোমাকে লক্ষ করে আমাকে বলল—এ লোক কিছুতেই চোর হতে পারে না। হাজার হাজার চোর-ডাকাত-খুনী দেখেছি আমি, এ নিশ্চয়ই পুলিসের লোক। আইনের বিরুদ্ধে গেলে চেহারায় যে ছাপ পড়ে—এর চেহারায় সে ছাপ নেই। তুমি খাল কেটে কুমির এনেছ, মায়া। আমি বললাম—খতম করে দিন না, তাহলেই তো চুকে যায়। চ্যাঙ বলল—দাঁড়াও, দেখা যাক ঝুড়িতে করে কি সাপ এনেছে এই নতুন সাপুড়ে। আমার মুঠি থেকে আর বেরোতে হবে না। লিউঙ ওর আসল পরিচয় বের করে ফেলবে তিনদিনের মধ্যেই। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ব্যাটা বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। জাল করেছে বলে লিউঙকে যে নোট দিয়েছিল, আমাদের এক্সপার্ট পরীক্ষা করে রায় দিয়েছে ওগুলো সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু ওর আসল মতলব কি? চ্যাঙ বলল—সেটা বের করতে অসুবিধে হবে না। আমাদের সাবধান থাকতে হবে।'

এই পর্যন্ত বলে থামল মায়া। রানার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চাইল। তারপর বলল, 'এখনও সময় আছে, পালিয়ে যাও তুমি, রানা। আজ কেবল তোমার জন্যেই বাড়ি যায়নি চ্যাঙ—আমাকেও রেখে দিয়েছে এই হোটেলে। তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে ও। এক বছর পর এই প্রথম হোটেলে রাত কাটাচ্ছে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছে ও।'

'অথচ বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই। আমার বিরুদ্ধে কিছুই খুঁজে পাবে না লিউঙ। কোনও ভাবে...'

খিলখিল করে হেসে উঠল মায়া। 'মনে হচ্ছে চ্যাঙের সামনে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত দিচ্ছ। তোমাকে কে জিজ্ঞেস করেছে তোমার আসল পরিচয়? আমি তোমার সম্পর্কে কিচ্ছু জানতে চাই না। তুমি চোর হলেই বা আমার কি, আর পুলিস হলেই বা কি? কিছুই যায় আসে না। কথা ছিল আমাকে উদ্ধার করবে এদের কবল থেকে—তার আগেই যাতে খতম না হয়ে যাও তাই সাবধান করে দিলাম। আমিও তোমার সাথে জড়িয়ে আছি কি না।'

'পালিয়ে যেতে বলছ, তাই যেতাম। ওদের ভাবগতিক আমারও ভাল লাগছে না। তোমাকে কথা না দিলে, আর তোমার ব্ল্যাকমেইলিং-এর ভয়ে আধমরা হয়ে না থাকলে আমি অনেক আগেই কেটে পড়তাম। আসতেই হলো, পাছে তুমি আবার চ্যাঙকে বলে দাও যে গুপ্তধনের সন্ধান আমি জানি, তাই।'

এবার আবার হেসে উঠল মায়া। পাগলের মত খিলখিল করে হাসল কিছুক্ষণ, তারপর দম নিয়ে বলল, 'তুমি একটা বুদ্ধু।'

'কেন?' অবাক হয়ে চাইল রানা মায়ার মুখের দিকে।

'চলো, পাশের ঘরে চলো। বলছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত ধরে টেনে তুলল সে রানাকে সোফা থেকে, তারপর যেন বল-ডান্স করছে এমনি ভাবে তালে তালে স্টেপিং করে নিয়ে গেল ওকে শোবার ঘরে। মুখে দুষ্টামির চাপা হাসি।

'আমি তোমার সব কথা জানি, রানা,' বলল মায়া খাটের কিনারায় বসে।

'কি জানো?'

'তুমি দুঃসাহসী এক বাঙালী স্পাই—মাসুদ রানা। এসেছ চ্যাঙকে ধ্বংস করতে।'

চমকে উঠল রানা। মায়া জানল কি করে? ব্যাপার কি? তবে কি সব প্রকাশ পেয়ে গেছে এদের কাছে?

'বলব, কি করে জানলাম?'

'জলদি বলো,' তাগিদ দিল রানা।

'গতকাল স্টীমারে তোমার পরিচিত একজন লোক বলল সব কথা। কোনও বিপদ দেখলে যেন আগে থেকে সাবধান করি তোমাকে, সে-ব্যাপারে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করল। তুমি নাকি তাদের রাষ্ট্রীয় অতিথি।'

কে হতে পারে? অবাক হয়ে যায় রানা। সে জানল কি করে যে মায়ার সাহায্য পাওয়া যাবেই?

'কি নাম তার?' জিজ্ঞেস করল রানা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে। কে বলল মায়াকে এসব কথা? নামটা জানবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল ওর মন।

চুপচাপ কিছুক্ষণ রানার অস্থিরতা উপভোগ করে মৃদু হাসল মায়া। বলল, 'লিউ ফু-চুং। তোমার সেই বন্ধু। ও নাকি সেদিন রিপালস বে হোটেলে আমাদের সমস্ত কথাবার্তা টেপ করে নিয়েছিল তোমার অজান্তে।'

'আচ্ছা! আশ্চর্য তো? আমাকে বলেনি কিছু।'

'তুমিও তো বলোনি ওকে কিছু। তুমিও তো সব ব্যাপার চেপে গেছ ওর কাছে।'

'বলিনি সে কেবল তোমার জন্যে, মায়া। বললেই আমাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিত, সেই ভয়ে বলিনি। তাহলে তোমাকে রক্ষার আর কোনও পথ থাকত না...'

'আমি তা জানি। ফু-চুং-ও জানে। মনে মনে সবজান্তার হাসি হাসছে সে, আর এই একটা ব্যাপারে তোমাকে ঠকাতে পেরে খুব পুলকিত হচ্ছে। কিন্তু আমার জন্যে এই ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে জেনে শুনে কেন ঝাঁপ দিলে তুমি, রানা? কি হতো একটা মেয়েকে উদ্ধার করতে এগিয়ে না এলে? একটা দস্যুকন্যার জীবনের কি দাম আছে? তোমার কাজ তো হাসিল হয়েই গিয়েছিল। এতবড় একটা বিপদের মুখে তুমি এগিয়ে এসেছ কেবল আমারই জন্যে ভাবতে আশ্চর্য লাগছে আমার। অদ্ভুত লাগছে। ধন্য মনে হচ্ছে নিজেকে। সেই সাথে আবার ভয় হচ্ছে। স্বার্থপরের মত তোমাকে এসব ব্যাপারে না জাড়ালেই বোধহয় ভাল করতাম। ভয় হচ্ছে...'

পাশের ঘরে টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে একসাথে চমকে উঠল ওরা দু'জন। কি মনে করে ছাতের দিকে চেয়েই এক লাফে ঘরের এক কোণে সরে গেল রানা।

'মায়া!' রানার কণ্ঠে উত্তেজিত জরুরী ভাব। 'এই ঘরের ছাতে লেন্স কিসের? নিশ্চয়ই ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশনের ক্যামেরা! আমরা ধরা পড়ে গেছি, মায়া। কেউ আমাদের দেখে ফেলেছে। এখন সংবাদ দিচ্ছে চ্যাঙকে।'

ভয়ে পাংশু হয়ে গেল মায়ার মুখ। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'এখন উপায়?'

'উপায় আছে। অত ভয় পেয়ো না। তুমি কিছু না জানার ভান করবে। একেবারে ন্যাকা বনে যাবে। আমি ব্যালকনি দিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি। কার্নিশ ধরে চলে যাব আমার ঘরে।'

'এত উঁচু থেকে যদি পড়ে যাও?' রানার একটা হাত ধরল মায়া।

'ওসব ভাববার সময় নেই এখন। কোনও ভয় নেই, বুঝতে পেরেছ?' হাসল রানা অভয় দিয়ে। দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে ব্যালকনির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওয়ালথারটা দাঁতে চেপে সড়সড় করে নেমে গেল সে পাইপ বেয়ে।

ওর ঘরের ঠিক আগের ঘরটায় দেখা গেল বাতি জ্বলছে। উঁকি দিয়ে দেখল রানা দরজা দুপাট খোলা।

দশমিনিট পর ঘুমিয়ে পড়ল রানা নিজের বিছানায়। বিশ্রাম দরকার।

দশ

পরদিন ঠিক রাত আটটায় কাপড় পরে নেমে এল রানা সপ্তম তলায়।

সকালে স্যার উইনসটন চার্চিলের চাচা লর্ড জন স্পেন্সার চার্চিলের কবর আর সেন্ট পল্স্ ক্যাথিড্রাল্ দেখার ছুতোয় বেরিয়ে পুরো শহরটা ভালমত দেখে এসেছে রানা। সাথে অবশ্য ছায়ার মত অনুসরণ করেছে চ্যাঙের লোক, কেয়ার করেনি সে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে ঝাড়া তিনঘণ্টা। বিকেলে ব্যালকনিতে বসে বসে দেখেছে সারি সারি সাম্পানের পেছনে অপূর্ব এক

রক্তিম সূর্যাস্ত। সী-গালগুলো চলে গেছে ওদের আস্তানায়। কালো হয়ে এসেছে বিকেলের প্রসন্ন মুখ। কেন জানি অকারণেই মনটা খারাপ হয়ে গেছে রানার। বিরাট বিশ্বজগতের তুলনায় সে যে কত ক্ষুদ্র, উপলব্ধি করেছে সে বিমর্ষ চিত্তে।

নিচে নেমেই ডিনার অর্ডার দিল রানা। গ্রিল্‌ড ম্যাকাও পিজিয়ন আর নারকেল তেলে ভাজা অফ্রিকান চিকেনের ঝাল পর্তুগীজ ডিশ। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখল বারের পাশে ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলটা খালি। সারাটা ফ্লোরেই একটা খালি খালি ভাব। জমে উঠবে সাড়ে আটটার পর। প্রকাণ্ড হোটেল সিসিল সরগরম হয়ে উঠবে তখন নানান জাতের মানুষের নানান রকম উন্মত্ততায়।

রানা লক্ষ্য করেছে হোটেলে ঢুকবার বা বেরোবার একমাত্র পথ হচ্ছে জুয়া খেলার হলঘরের মধ্যে দিয়ে। এই একমাত্র পথে ওপর নিচে ওঠানামা করতে হলে অতিবড় সংযমী পুরুষের পক্ষেও জুয়া খেলার লোভ থেকে আত্মসংবরণ করা শক্ত হয়ে পড়বে। খেলা মানেই হারা।

আর আছে সশস্ত্র রক্ষী। শক্ত সমর্থ চেহারার চৌকস লোক—কোমরে রিভলভার আর গুলিভর্তি বেল্ট। নির্বিকার ভঙ্গিতে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর। ক্লান্তি আর একঘেয়েমির ছাপ প্রত্যেকটি জুয়াড়ীর চোখে মুখে, বসবার ভঙ্গিতে। বেশির ভাগই স্ত্রীলোক।

চমৎকার ডিনার শেষে চমৎকার পুডিং, তারপর এল কফি। ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করে জেনে নিল রানা চ্যাঙ নেই হোটেলে। ডিনার শেষ করে ঘড়ির দিকে চাইল সে—আটটা বেজে বিশ। একটা ব্র্যান্ডি হাতে নিয়ে আরাম করে বসল সে পা ছড়িয়ে।

রানা ভাবছে, এখন পর্যন্ত আক্রমণের কোনও লক্ষণ যখন নেই, তখন বোধহয় টের পায়নি ওরা কিছু। কিন্তু ব্ল্যাকজ্যাক খেলার শেষে কি হবে? কিভাবে শুরু হবে আসল ঘটনাটা? ফু-চুং-কে কিছু জানিয়ে আসতে পারেনি সে—ও কি ধরা পড়ল? ওকে যে ম্যাকাও পাঠানো হয়েছে সে খবর কি পেল চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস? ঠিক সময় মত যদি সাহায্য না আসে তাহলে?

দেখা যাক, যা হবার হবে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল রানা। দেখল, ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলে এসে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল রানা সেই টেবিলের দিকে। সামনাসামনি হতেই মুচকি হাসল মেয়েটি।

সারাদিন আজ রানা অপেক্ষা করেছে এই মুহূর্তটির জন্যে। এ পর্যন্ত ওর জানা আছে কি কি ঘটবে, এরপর থেকেই সব কিছু আবছা। কোনও ধারণাই নেই তার কি ঘটতে চলেছে এই খেলার পর। তাই ভেতর ভেতর একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।

কিন্তু আশ্চর্য সাদামাঠা ভাবে শেষ হয়ে গেল খেলা। তিন মিনিটের মধ্যেই আটহাজার ম্যাকাও পতাকা জিতে ফেলল রানা। যুবতীর তাস শাফল্‌ করবার অস্বাভাবিক নৈপুণ্য রানাকে বিস্মিত করতে পারল না, কারণ রানা আরও কিছু বিস্ময়ের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সাদামাঠা ভাবে খেলা শেষ হয়ে যেতেই যন্ত্রচালিতের মত উঠে চলে গেল মেয়েটা টেবিল থেকে। বোকার মত বসে রইল রানা।

এখন? এখন কি করবে সে?

লাল প্লেক ক'টা ভাঙিয়ে নিল রানা কাউন্টার থেকে, তারপর নেমে এল নিচতলায়। ভাবল, রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করে দেহের আলস্যটা কাটিয়ে নেবে।

ফুটপাথ ধরে গজ বিশেক যেতেই পাশে এসে থামল একটা ট্যাক্সি। হাত নেড়ে নিষেধ করল রানা, লাগবে না। কিন্তু নাছোড়বান্দা ড্রাইভার স্লো-স্পীডে চলতে থাকল পাশাপাশি। বিরক্ত হয়ে চাইল রানা একবার গাড়িটার দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ির ভেতরের কার্টিসি লাইটটা একবার জ্বলেই নিভে গেল। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে লিউ ফু-চুং।

বিনা বাক্যব্যয়ে দরজা খুলে পাশের সীটে উঠে বসল রানা। দ্রুত এগিয়ে চলল গাড়ি বড় রাস্তা ধরে।

'তুই খবর পেলি কি করে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোর ওপর নজর রাখবার জন্যে লোক ছিল। আমাকে একটা ফোন করে দিয়েই ও তোর সাথে একই স্টীমারে ম্যাকাও চলে এসেছে। এখান থেকেও আবার কন্ট্যাক্ট করেছে আমাদের সঙ্গে ওয়্যারলেসে। আমি আগে ভাগেই চলে এসেছি—রাত সাড়ে এগারোটায় এসে পৌঁছবে আমাদের সাবমেরিন। কাজ সেরে আজই ফিরে যাব আমরা।'

'তুই আর হোটেল বিল্টমোরে যাস্‌নি?'

'নাহ্। পাগল নাকি? টিয়েন হং-এর অবস্থা দেখেই সাবধান হয়ে গেছি আমি।'

'টিয়েন হং মানে সেই হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের জকি তো? ওর আবার কি হলো?'

'কাল সন্ধের সময় খুন হয়েছে ও নিজের ঘরে। সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড। বুকের ওপর ছুরি দিয়ে গেঁথে রেখে গেছে নোটটা। লিউঙের কাজ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দু'জন। তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে সাবমেরিন আসছে কি করতে?'

'স্মাগলিং চ্যানেলটা ক্লোজ করে দেব চিরতরে। বেইজিং থেকে হুকুম এসেছে—ধ্বংস করে দাও।'

'পর্তুগীজ এলাকায় এ-ধরনের কাজ করলে তুমুল আন্দোলন হবে না?'

'হতে পারে। হয়তো দুনিয়া ফাটিয়ে চিৎকার করবে। কিন্তু আমাদের কাজ আমাদেরকে করতেই হবে। আমি তো বুঝি না, তামাম দুনিয়া দখল করে সীমান্ত থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরের এই ছোট্ট জায়গাটা কেন বাদ রাখল গণচীন সরকার। যত রাজ্যের অ-কাজ কু-কাজ সব এখানে। আফিম আর স্বর্ণের ঘাঁটি। এখানে না আছে ইনকাম-ট্যাক্স, না আছে একচেঞ্জ কন্ট্রোল। ফরেন কারেন্সি আর সোনা আমদানী-রপ্তানীর ওপর কোনই বাধা-নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ নেই। দিনের পর দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। এদের সঙ্গে আবার হাত মিলিয়েছে হংকং-এর যত গুণ্ডা-পাণ্ডা।'

'কিভাবে ধ্বংস করবি, কোনও প্ল্যান নিয়েছিস?'

'সাবমেরিনে আসছে তিরিশজন এক্সপার্ট। টিএনটি আর বাজুকা থাকবে, দরকার হলে ট্যাঙ্ক নামিয়ে দেব। কিন্তু তোর প্ল্যানটা আগে বল। তুই তো, শালা,

মেয়েটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিস। ওকে বের করে আনবি কি করে? কি ঠিক করেছিস? আমার ওপর তো অর্ডার দেয়া হয়েছে এইসব হাঙ্গামার আগেই তোকে নিরাপদ দূরত্বে যেন সরিয়ে ফেলি। তোর প্ল্যানটা কি শুনি?'

'টাইম-বম্ব ঠিক ক'টার সময় ফাটাবি?'

'জিরো আওয়ারে। ঠিক রাত বারোটায়।'

'আমি একটা প্ল্যান ঠিক করেছি। মন দিয়ে শোন্...'

মন দিয়ে শুনবার আর সুযোগ হলো না। হঠাৎ গলার স্বর বদলে ফু-চুং বলল, 'খুব সম্ভব আমাদের পেছনে লেজ লেগেছে, রানা। সামনেও আছে, পেছনেও। দুটো গাড়ি। পেছনে তাকাস না। ওই যে সামনের ওপেলটা দেখা যাচ্ছে, দু'জন লোক বসা। দুটো রিয়ার-ভিউ মিরর লাগানো আছে ওতে। আমাদের লক্ষ্য করছে অনেকক্ষণ ধরে। পেছনের সাদা একটা স্পোর্টস্ মডেল জাগুয়ারে আছে আরও দু'জন। এতক্ষণ ছিল না, এই মিনিট পাঁচেক হলো দেখছি। কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। তুই রেডি থাকিস আর লক্ষ রাখিস, আমি পরীক্ষা করে দেখি সত্যিই ওরা চ্যাঙের লোক কিনা।'

জোরে অ্যাক্সিলারেটর চেপে ইগনিশন্ সুইচ অফ করে দিল ফু-চুং। 'ঠাস' করে পিস্তলের মত একটা শব্দ বেরোল এক্‌জস্ট পাইপ দিয়ে এঞ্জিন ব্যাক ফায়ার করতেই। সাথে সাথেই পেছনের দুজন লোকের হাত পকেটে ঢুকল।

'ঠিক ধরেছিস্। আওয়াজ হতেই পকেটে হাত ঢুকেছে ওদের অভ্যাসবশে। তুই এক কাজ কর ফু-চুং, আমাকে নামিয়ে দে এখানে। তোকে কিছুই বলবে না ওরা। আমার সাথে সাথে তুই ধরা পড়লে ক্ষতি হয়ে যাবে অনেক।'

'শাট আপ!' একবার কড়া করে চাইল ফু-চুং রানার দিকে। 'মায়ার কাছে গিয়ে বীরত্ব দেখাস, এখানে নয়। তোকে এখন নামিয়ে দিলে আমার চাকরি থাকবে মনে করেছিস? তাছাড়া আমাকে ভীতুই বা মনে করলি কেন? তুই তোর ওই খেলনাটা বের করে তৈরি থাক্। হাতের টিপটা আগের মতই আছে তো? তাহলে আর চিন্তা নেই, বসে বসে দেখ কেমন ঘোল খাইয়ে দিই শালাদের। মনে আছে, সেবার সাইগনে দু'জন কি বিপদে পড়েছিলাম? সেই রকম পিস্তলের খেল্ একটু দেখাতে হবে, দোস্ত।'

আলগোছে পিস্তলটা শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে হাতের মুঠোয় নিল রানা। ওর মনের মত কাজ পেয়েছে এইবার।

লম্বা সোজা রাস্তাটায় লোকজন বিশেষ নেই। চল্লিশ মাইল স্পীডে চলছে ওরা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জাগুয়ার, আর হাত পাঁচেক আছে, ঠিক এমনি সময় ঘ্যাঁচ করে হঠাৎ ফুল ব্রেক করল ফু-চুং। সাবধান না থাকলে রানার নাক ছেঁচে যেত ড্যাশবোর্ডে। বিশ্রী শব্দ তুলে অল্প খানিকটা স্কিড্ করে থেমে পড়ল গাড়িটা। সাথে সাথেই পেছন থেকে জোরে এক ধাক্কা মারল এসে জাগুয়ারটা। প্রচণ্ড একটা ধাতব শব্দ হলো। জাগুয়ারের সামনের উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে পড়ে গেল চুর হয়ে। ধাক্কার চোটে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল রানাদের ট্যাক্সিটা। এবার ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে পেছনের বাম্পারটা জাগুয়ারের সাথেই ভেঙে রেখে এগিয়ে চলল ফু-চুং।

'কি দেখলি?' জিজ্ঞেস করল ফু-চুং গর্বের হাসি হেসে।

'র‍্যাডিয়েটার গ্রিল বার্স্ট করেছে ব্যাটাদের, নাকটা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, উইণ্ডস্ক্রীন গায়েব,' পেছনে ফিরে বসল রানা। ততক্ষণে অনেকদূর চলে এসেছে ওদের ট্যাক্সি। থেঁতলে চাকার সঙ্গে আটকে যাওয়া উইং দুটো তুলবার চেষ্টা করছে লোক দু'জন গাড়ি থেকে নেমে। অল্পক্ষণেই আবার চালু করতে পারবে, সন্দেহ নেই।

'এতেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে গেছে। ওই দ্যাখ, ওপেলটা রাস্তার এক পাশে থেমে দাঁড়াচ্ছে। মাথা নিচু করে ফ্যাল্। গুলি চালাতে পারে ওরা। সাবধান! ছুটলাম।'

পিঠের কাছে অনুভব করতে পারল রানা, থার্ডগিয়ারে ফুল অ্যাক্সিলারেটার দিয়েছে ফু-চুং। রানা বসে পড়েছে নিচে সীট ছেড়ে। সীটের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় চোখ দুটো ড্যাশবোর্ডের চেয়ে একটু উঁচু রেখে এক হাতে চালাচ্ছে ফু-চুং।

সাঁ করে ওপেলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। সাথে সাথেই রিভলভারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ এল কানে। একটা গুলি বডিতে এসে লাগল ঠং করে—বোধ হয় চাকা সই করেছিল। আর দ্বিতীয় গুলিটা উইণ্ডস্ক্রীন ফুটো করে একরাশ কাঁচের টুকরো ছড়াল গাড়িময়। তৃতীয় গুলিটা কি হলো বোঝা গেল না। একটা অশ্লীল চীনা গালি বেরিয়ে এল ফু-চুং-এর মুখ থেকে।

পেছনের সীটে চলে গেল রানা। পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঠুকে পেছনের কাঁচটা ভেঙে ফেলল। ওপেলটা এবার তেড়ে আসছে ওদের দিকে। যেন রাগে অগ্নিশর্মা, জ্বলছে ওর দুই চোখ। হেড লাইট সই করতে যাচ্ছিল রানা। ফু-চুং বলল, 'এখন গুলি করিস না। সামনেই একটা শার্প টার্ন নিচ্ছি। ঘুরেই দাঁড়িয়ে পড়ব। তখন গুলি করিস।'

ফু-চুং-এর কণ্ঠস্বর কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল।

চট্ করে একটা হাতল ধরে ফেলল রানা গাড়িটা ডানদিকে মোড় নিতেই। তিন সেকেণ্ড দুই চাকার ওপর চলে আবার সোজা হয়ে থেমে গেল ট্যাক্সি প্রথম বাড়িটার আড়ালে। ঝট্ করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল রানা গাড়ি থেকে। ওপেলটা তখন মোড় নিচ্ছে ভীষণ বেগে। টায়ারের ঘষায় বিশ্রী একটা শব্দ উঠছে রাস্তা থেকে। হেড লাইটটা ক্রমেই সরে আসছে ডানদিকে। হেলে গিয়েছে গাড়িটা ডানধারে। রানা বুঝল, এখনই সময়, সোজা হবার আগেই শেষ করতে হবে।

তিনটে অব্যর্থ গুলি লক্ষ্যভেদ করল।

আর সোজা হলো না ওপেলটা। রাস্তার মাঝের আইল্যাণ্ডে উঠে কোণাকুণি ধাক্কা খেলো একটা গাছের সঙ্গে। আবার রাস্তায় নেমে সোজাসুজি গুঁতো মারল একটা ল্যাম্প পোস্টকে। তারপর কয়েক হাত পিছিয়ে এসে কাত হয়ে উল্টে পড়ে গেল। প্রচণ্ড ধাতব শব্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল বাড়িগুলোর গায়ে।

হঠাৎ লক্ষ্য করল রানা আগুন দেখা যাচ্ছে গাড়ির মুখ থেকে। গাড়ি থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে একজন লোক। রানা বুঝল, এখন যে-কোনও মুহূর্তে ভ্যাকিউম পাম্প বেয়ে এগিয়ে আগুনটা ফুয়েল ট্যাঙ্কে পৌঁছে যাবে। তাহলে আর

বেরোতে হবে না ভেতরের কাউকে।

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল রানা সেদিকে, এমন সময় একটা গোঙানির শব্দে চমকে ঘুরে দাঁড়াল সে। দেখল, মাথাটা ঝুলে পড়েছে ফু-চুং-এর—গড়িয়ে পড়ল সে সীট থেকে গাড়ির মেঝেতে। জ্বলন্ত ওপেলের কথা ভুলে ছুটে এসে দাঁড়াল রানা ট্যাক্সির পাশে। এক ঝটকায় দরজা খুলেই দেখল চারদিকে রক্ত লেগে আছে। ফু-চুং-এর বাম হাতের আস্তিন পর্যন্ত চুপচুপে ভেজা তাজা রক্তে। আবার সীটের ওপর টেনে তুলল রানা ফু-চুংকে। চোখ মেলে চাইল ফু-চুং।

'রানা! জলদি পালা। এক্ষুণি ওই জাগুয়ারটা এসে পড়বে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল আমাকে।'

'ঠিক আছে। তুই একটু সরে বস্। কিচ্ছু ভাবিস না।' সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা জ্বলন্ত ওপেলকে পেছনে ফেলে। রাস্তায় ইতিমধ্যেই কিছু লোক জড়ো হয়ে তামাশা দেখতে লেগেছে।

'সোজা চল। খানিকদূর গিয়েই ডানদিকের রাস্তায় উঠে পড়বি। কিছু দেখা যাচ্ছে আয়নায়?' জানতে চাইল ফু-চুং।

একটা হেডলাইট দেখা যাচ্ছে। ওটা পুলিসের মোটর সাইকেল না জাগুয়ারের অবশিষ্ট এক চোখ বোঝা যাচ্ছে না। একশো গজ দূরে আছে। দ্রুত এগিয়ে আসছে এই দিকে।

'ছুটে চল। লুকাতে হবে আমাদের কোথাও। সিনেমা হল আছে একটা সামনে। ডানদিকে ঘোরা। ওই যে বাঁয়ে দেখা যাচ্ছে আলোগুলো, ওটাই সিনেমা হল। এসে গেছি। স্পীড কমা। জলদি বাঁয়ে কাট। হ্যাঁ। সোজা ঢুকে পড় ওই গাড়িগুলোর পাশে। লাইট অফ। ব্যস।'

বিশ পঁচিশটা গাড়ি দাঁড় করানো আছে। দুটো গাড়ির মাঝখানে ফাঁক পেয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল রানা। চুপচাপ কেটে গেল তিন মিনিট। পাশ ফিরে পেছন দিকে চাইল। নাহ্, একটা মরিস মাইনর আর অস্টিন এ-ফরটি এসে ঢুকল গেট দিয়ে, ভদ্রলোকের মত নেমে চলে গেল যাত্রীরা টিকেট কাউন্টারের দিকে। একটা ছোকরা পান-বিড়ি-সিগারেট হেঁকে চলে গেল।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে ফু-চুং। দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'আর তিন মিনিট দেখব, তারপর আমাকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

'একটু সহ্য করে থাক, ভাই। বেশিক্ষণ লাগবে না। তোর বুদ্ধিটা বোধহয় কাজে লেগে গেল। এ-যাত্রা বেঁচেই গেলাম বোধহয়।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল রানা পেছনের অন্ধকারে। কারও দেখা নেই। আশপাশের গাড়িতেও কোন রকম সন্দেহজনক কিছু পেল না সে। ভাবছে এক্ষুণি ডাক্তারের উদ্দেশে রওনা হবে, না আরও দু'এক মিনিট অপেক্ষা করবে—এমন সময় নাকে এল আফটার শেভ্ লোশনের গন্ধ। পরমুহূর্তেই একটা কালো মূর্তি উঠে এল মাটি ফুঁড়ে ঠিক জানালার পাশে। হাতের সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল সোজা রানার কপালের দিকে ধরা। ফু-চুং-এর ধারের জানালা দিয়ে একটা মৃদু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'চিৎকার করবার চেষ্টা কোরো না। ধীরস্থির ভাবে পরাজয় মেনে নাও। নইলে

অসুবিধায় পড়বে।'

রানা ওর পাশের লোকটার ঘর্মাক্ত মুখের দিকে চাইল ভাল করে। চোখ দুটো হাসছে ওর টিটকারির হাসি। ফিসফিস করে বলল, 'লক্ষ্মী ছেলের মত বেরিয়ে এসো বাইরে। আমাদের শুধু তোমাকে দরকার। নইলে দু'জনেরই লাশ নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

রানা ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ফু-চুং-এর দিকে। ব্যথায় কুঁচকে গেছে ওর গাল দুটো। যে-কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে। এক্ষুণি চিকিৎসা দরকার। প্রচুর রক্তক্ষরণে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ধরা আছে ওর গলার ওপর ঠেসে। আশপাশের কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। সিনেমা হলের পার্কিং কর্ণারটা অন্ধকার মত। কাছেই কয়েকটা স্টেশনারী দোকান আছে, তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না? দেখা যাক।

'আমি নেমেই যাই, ড্রাইভার। দু'জন একসাথে মারা পড়ার চাইতে আমার নেমে যাওয়াই ভাল। সম্ভব হলে ফিরে এসে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। নিজের দিকে লক্ষ্য রেখ।'

রানার কথাটা শেষ হতেই ওর পাশের দরজাটা খুলে গেল। তখনও পিস্তলটা ধরা আছে রানার দিকে স্থির ভাবে। ওপাশের লোকটা বলল, 'তোমাকেও ছাড়া হবে না, বাবাজী। তোমার অপরাধের শাস্তিও সময় মত পাবে। এখন আপাতত তুমি আহত, হাঁটিয়ে নিতে পারব না, তাই রেখে যাচ্ছি। কিন্তু ম্যাকাও ছেড়ে যাবে কোথায়? ড্রাইভারগিরি ভুলিয়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

'আমি দুঃখিত, বন্ধু,' করুণ ক্লান্ত শোনাল ফু-চুং-এর কণ্ঠস্বর। 'তোমাকে বদমাইশগুলোর হাত থেকে রক্ষা করতে পারলাম না। আমি···' এটুকু বলার পরই ঠক করে বেশ জোরে একটা শব্দ হলো। ওপাশের লোকটার পিস্তলের বাটটা ফু-চুং-এর কানের পেছনে আঘাত করেছে। নীরবে কাত হয়ে ঢলে পড়ল ফু-চুং-এর ক্লান্ত দেহ।

দাঁতে দাঁত ঘষল রানা, পেশীগুলো দৃঢ় হয়ে উঠল ওর দেহের। দুটো পিস্তলের দিকে চাইল সে একবার নিষ্ফল আক্রোশে। ওর ওয়ালথারটা হোলস্টার থেকে বের করবার সময় পাওয়া যাবে না। চারটে চোখ লোভাতুর দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। ছুতো খুঁজছে যেন খুন করবার। ও কিছু একটা করবার চেষ্টা করুক, তাই চাইছে ওরা আন্তরিক ভাবে। নিজেকে সামলে নিল রানা। নেমে এল সে গাড়ি থেকে। হত্যার চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তাই করতে পারল না সে এই মুহূর্তে।

'সোজা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাও। স্বাভাবিক থাকো। আমাদের পিস্তল তৈরি থাকল, কোনও চালাকির চেষ্টা করলে···' কথাটা আর শেষ করল না আফটার-শেভ লোশন মাখা লোকটা। ওর ডান হাতটা এখন কোটের পকেটে চলে গেছে। রানা ফিরে দেখল দ্বিতীয়জনেরও একই অবস্থা—হাত চলে গেছে কোটের পকেটে, অদৃশ্য হয়েছে পিস্তলটা।

স্টেশনারী দোকানগুলোর পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল তিনজন রাস্তার ওপর দ্রুতপায়ে। আকাশে চাঁদ উঠেছে আধখানা।

এগারো

সাদা জাগুয়ারটা রয়েছে গেটের বাইরে ডানধারের দেয়াল ঘেঁষে। রানার পিস্তলটা বের করে নিল একজন—রানা বাধা দিল না। নীরবে ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে বসল সে।

'পিস্তলটা তৈরি থাকল। কোনও রকম কৌশল করতে চেষ্টা করলেই মারা পড়বে, রানা।' পেছনের সীটে উঠে বসে বলল একজন।

'চললাম কোথায় জানতে পারি?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'সেটা দেখতেই পাবে।'

চলতে আরম্ভ করল গাড়ি। স্ট্রীট অফ হ্যাপিনেসের উজ্জ্বল বাতি ছাড়িয়ে হোটেল সিসিলকে বাম ধারে রেখে ছুটল ওরা সামনে। রানা বুঝল চ্যাঙের আসল আড্ডায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। কয়েকটা ডাইভারশানে স্পীড একটু কমল, বাকি সময় সত্তরের নিচে নামছে না কাঁটা। গাড়িটা কি অ্যাক্সিডেন্ট করবার চেষ্টা করবে সে? এত স্পীডে অ্যাক্সিডেন্ট হলে মৃত্যুর সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ওর নিজেরই। সেই জন্যেই বোধহয় ওকে ড্রাইভারের পাশের সীটে, অর্থাৎ 'ডেথ-সীটে' বসানো হয়েছে। সামনের সোজা রাস্তাটার পাশে সারি সারি ল্যাম্প পোস্ট মেট্রোনোমের টোকার মত টিক টিক করে পার হয়ে যাচ্ছে। হু-হু করে বাতাস, ধুলোবালি আর পোকামাকড় আসছে ভাঙা উইণ্ডশীল্ড দিয়ে। মাথাটা নিচু করে চ্যাঙের কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে করতে চলল রানা। আধঘণ্টা চলবার পর ডানদিকে মোড় নিল গাড়িটা।

কোথায় চলেছে রানার জানাই আছে। গাড়িটা থেমে দাঁড়ানোর আগে মাথা তুলল না সে ওপরে। একটা প্রকাণ্ড গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। গেটের দুপাশে দুটো সেন্ট্রি ঘর। সমস্ত এলাকাটা উঁচু দেয়ালে ঘেরা। বোতাম টিপতেই মোটা একটা কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে।

'বলুন?'

'মাসুদ রানা।' ড্রাইভার জবাব দিল উঁচু গলায়।

'ঠিক আছে। ঢুকে পড়ো।'

ঘড় ঘড় করে খুলে গেল গেট। ভেতরে ঢুকেই রানা দেখল গাছপালার আড়াল থেকে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ির কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। পেছন ফিরে দেখল ধীরে বন্ধ হয়ে গেল গেট। একটা উঁচু ঢিবি ঘুরতেই বাড়িটার সামনে এসে উপস্থিত হলো ওরা।

'বেরোও,' আদেশ করল ড্রাইভার। মরা পোকা আর মাছির রক্তে লাল হয়ে আছে ওর মুখটা।

নেমে এলো রানা গাড়ি থেকে। সামনে-পেছনে চলল দু'জন পিস্তল হাতে।

হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে যেমন দুই পাল্লা সুইং-ডোর থাকে তেমনি একটা দরজা

দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল ড্রাইভার। রানা বুঝল এই সুযোগ। পেছন থেকে পিস্তলের গুঁতো খেয়ে এগিয়ে গেল সে। ঘরের ভেতর কয়েকটা সোফা পাতা, লোকজন নেই।

পেছন থেকে দুই বাহু চেপে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল সে ড্রাইভারকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রবল বেগে ছুঁড়ে দিল ওকে সুইং-ডোরের ওপর। পেছনের লোকটা মাত্র অর্ধেকটা শরীর বের করেছিল দরজা দিয়ে, এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে পড়ে গেল চিৎ হয়ে।

ড্রাইভারটা ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে। ধাঁই করে একটা ঘুসি পড়ল ওর নাক বরাবর, আর সাথে সাথেই রানার আরেকটা হাত তীব্র আঘাত করল ওর কব্জির ওপর, ছিটকে সশব্দে মাটিতে পড়ল পিস্তলটা।

পেছনের লোকটা সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। দরজার ফাঁক দিয়ে ওর পিস্তলটা বেরিয়ে খুঁজছে রানাকে। ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল রানা মাটিতে। ড্রাইভারের পিস্তলটা তুলে নিয়ে দ্রুত দুটো গুলি করল সে পেছনের লোকটার কব্জি লক্ষ্য করে। চিৎকার করে পড়ে গেল সে দরজার ওপাশে। এদিকে জুতোসুদ্ধ এক পা দিয়ে চেপে ধরল ড্রাইভার রানার ডান হাত। এক লাথিতে রানার হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা। এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রানার ওপর। দুই হাতে চুলের মুঠি চেপে ধরে ঠুকতে আরম্ভ করল মুখটা মেঝের ওপর। নাক বাঁচাবার জন্যে একপাশে ফিরিয়ে রাখল রানা মুখ। পিস্তলটা নাগালের মধ্যেই রয়েছে। যে আগে তুলতে পারবে তারই জয়।

কিছুক্ষণ নীরবে বন্য জন্তুর মত যুদ্ধ করল দু'জন। অনেক চেষ্টা করে হাঁটু ভাঁজ করল রানা, তারপর এক ঝটকায় নামিয়ে দিল লোকটাকে গলায় পা বাধিয়ে। রানার উঠে দাঁড়াবার আগেই বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল ড্রাইভার এবং হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল রানার থুতনিতে। মাথার মগজ পর্যন্ত নড়ে উঠল এই আঘাতে। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল ও মাটিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে পড়ল ওর ওপর লোকটা। পেটটা বাঁচাবার জন্যে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা। মাথাটা এসে পড়ল ওর পাঁজরের ওপর। অসহ্য ব্যথায় একটা অদ্ভুত বিকৃত গোঙানী বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে। কিন্তু সামলে নিল সে। বাঁচতেই হবে তাকে। একপাশ ফিরে লোকটার দুটো হাতই পিঠ দিয়ে চেপে ধরল রানা, তারপর বাম হাতে দুটো ওজনদার লেফট্ হুক চালিয়ে দিল। মাথাটা একটু উঁচু করতেই ডান হাতটা চালাল দাও দিয়ে কোপ মারার মত লোকটার কাঁধের পেশীর ওপর।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল লোকটা। চিতাবাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ওর ওপর। পোকামাকড়ের রক্তের সঙ্গে মিশল ওর নাক দিয়ে বেরোনো টাট্‌কা তাজা রক্ত। থেঁতলে গেল ওর নাকটা রানার প্রচণ্ড ঘুসিতে। দুটো দাঁত খসে পড়ল মোজাইক করা মেঝের ওপর। এবার ওর একটা হাত ধরে ফেলল রানা। অন্যহাতে বেল্টটা শক্ত করে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল ওকে। একপাক ঘুরে সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারল সে দেহটা দেয়ালের গায়ে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ল দেহটা, আর উঠল না।

হাঁপাচ্ছে রানা। ফুলে ফুলে উঠছে ওর প্রশস্ত বুক। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে

দাঁড়াল সে। ঘামে ভেজা চুলের মধ্যে বাম হাতের আঙুলগুলো চালিয়ে দিল। ফু-চুং-এর প্রতিশোধ নিতে পেরে একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করল সে।

'কাট্।'

চমকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দেখল দুই হাত কোমরে রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে চ্যাঙ। দুইপাশে দু'জন সহকারী। ডান পাশে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে লোবো। পাশের লোকটাকে চিনতে পারল না সে, মনে হলো দেখেছে কোথাও। যেন সিনেমার শূটিং হচ্ছে, মারপিটের সীন শেষ হতেই ডিরেক্টর চিৎকার করে বলল, 'কাট্'। কতক্ষণ ধরে ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই মারামারি দেখছিল কে জানে।

শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ-মুখের ঘাম মুছে নিল রানা যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে। দেখল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে চ্যাঙের তীব্র দুটো চোখ। চীনা ভাষায় কিছু বলল চ্যাঙ ওর সহকারীদের, তারপর ঘুরে একটা দরজা দিয়ে চলে গেল বাড়ির ভেতর।

এগিয়ে এল লোবো আর তার সাথের লোকটা। সাথের লোকটাকে আহতদের তদারকির নির্দেশ দিয়ে নিজে রানার ভার গ্রহণ করল লোবো। পেছন থেকে মেরুদণ্ডের ওপর রিভলভারের নলের গুঁতোয় রানা বুঝল সামনে এগোতে হবে ওকে। দরজা দিয়ে ঢুকে একটা ডাইনিংরূম। বড় একটা টেবিলের দুইপাশে বারোটা করে চেয়ার—টেবিলের মাথায় একটা কারুকার্যখচিত চেয়ার দেখে বোঝা গেল ওটা চ্যাঙের আসন। ডাইনিংরূম থেকে বেরিয়ে একটা বারান্দা—কিছুদূর গিয়ে আবার দুটো ঘর পেরিয়ে ভারি পর্দা তুলতেই অবাক হয়ে গেল রানা।

একটা মোটা খুঁটির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে মায়া ওয়াং। শরীরে কয়েকটা আঘাতের দাগ লাল হয়ে আছে। রানাকে দেখে ওর দুই চোখে আশার আলো জ্বলে উঠেই দপ্ করে নিভে গেল পেছনে লোবোর ওপর চোখ পড়তে। মাথাটা নিচু করল সে। অল্পদূরে একটা টেবিলের ওপাশে বসে আছে চ্যাঙ। কালো আলখেল্লা, মাথায় টাক, থুতনিতে দু'চারটে দাড়ি, আর অসম্ভব বড় বড় কান—মনে হচ্ছে যেন চীনা জাদুকর। শিড়দাঁড়ায় আরেকটা গুঁতো খেয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল রানা।

এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল রানা, একটা হান্টারের বাড়ি পড়ল পিঠের ওপর। ইলেকট্রিক হুইপ। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত থমকে দাঁড়িয়ে গেল রানা। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একজন। হাতে তিন ফুট লম্বা হান্টার। এটা দিয়েই মারা হয়েছে মায়াকে। মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল রানার। কিন্তু এখন সংযম হারালে অনিবার্য মৃত্যু। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল সে। চ্যাঙের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'দাঁড়িয়ে থাকো। বসতে কে বলেছে তোমাকে?' বলল চ্যাঙ।

'ব্যাপার কি? এভাবে আমাকে ধরে এনে মারধোর করা হচ্ছে কেন?'

এ কথার উত্তর না দিয়ে আবছা একটা ইঙ্গিত করল চ্যাঙ লোবোকে। রিভলভারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে আরেকটা খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলল সে রানাকে। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দমে গেল রানা। বুঝল এটা চ্যাঙের টরচার

চেম্বার। বাঁধা শেষ হতেই মুখ খুলল চ্যাঙ।

'কেন মারধোর করা হচ্ছে জিজ্ঞেস করছিলে···তুমিই বলো দেখি, কেন?'

'আমি তো বুঝতে পারছি না কি অপরাধ করেছি আমি তোমাদের কাছে। তোমাদের কাজ করেছি, টাকাও পেয়ে গেছি। ব্যস, চুকে গেছে। আমার পেছনে একপাল কুকুর লেলিয়ে দেবার মানে কি? যেমন কুকুর তেমন মুগুর দিয়ে দিয়েছি—আমার তো মনে হয় না তাতে আমার কোনও দোষ হয়েছে।'

'ব্যাপারটা বোঝোনি এখনও। একটু আপ-টু-ডেট করে দিচ্ছি তোমাকে। অল্পক্ষণ আগে হংকং-এর সাথে টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। তারা তোমার সম্পর্কে অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলছে। এবার নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ তোমাকে এখানে ধরে আনবার কারণটা?'

'না, পারিনি।' মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছে রানার।

'তবে শোনো। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে তুমি অরুণ দত্ত নও—সত্যিকার অরুণ দত্ত এখন সাংহাই-হাজতে। অরুণ দত্তের বাবা-মা তোমার ফটো দেখে চিনতেই পারেনি।'

'ঠিক। আসলে আমি অরুণ দত্ত নই,' অম্লান বদনে বলল রানা। 'কাজটা আমি অরুণ দত্তের কাছ থেকে নিয়েছিলাম। ও ভয় পাচ্ছিল এই কাজটা নিতে। আমার টাকার দরকার ছিল তাই ওর নাম ভাঁড়িয়ে চলে এসেছি।' গাড়িতেই উত্তরটা তৈরি করেছে রানা।

'চমৎকার! কিন্তু আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। শেষ হলে উত্তর দিয়ো। যে নোট জাল বলে দিয়েছিলে লিউঙের কাছে, এবং নিজেকে মস্ত বড় জালিয়াত বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলে তা আমাদের এক্সপার্ট পরীক্ষা করে রায় দিয়েছে একবিন্দু নকল নয়—একেবারে খাঁটি। তারপর হারিয়ে গেল ল্যাংফু। তোমার ওপর নজর রাখবার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিল ওকে। তারপর তোমার ঘরের দরজায় ফুটো পাওয়া গেল, এবং পাশের ঘরের চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের স্পাইটা আর এলো না হোটেলে ফিরে। তোমার অ্যাটাচি কেসের একটা গোপন কুঠুরিতে পিস্তলের একখানা সাইলেন্সার পাইপ পাওয়া গেল। তারপর জকি টিয়েন হংকে ঘুষ দেয়া হয়েছে সন্দেহ করে তার ঘর সার্চ করতেই বেরিয়ে পড়ল ওর বাক্স থেকে দু'হাজার ডলার। (এই পর্যন্ত আসতেই চমকে উঠল রানা ভয়ানক ভাবে। বুঝল, ভুল যা হবার হয়ে গেছে) এবং নম্বর মিলিয়ে দেখা গেল সেগুলো তোমার টাকা। লিউঙ দিয়েছিল টাকাগুলো তোমাকে রেস খেলবার জন্যে। আর গত রাতে তোমাকে দেখতে পাওয়া গেল ওই হারামজাদির ঘরে। এই সব ঘটনা কি তোমাকে এখানে ধরে আনবার কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়?' একটু থামল চ্যাঙ। 'এবার বলে ফেলো তুমি কে এবং কি উদ্দেশ্যে এসেছ।'

যেন সম্মোহন করছে এমনি ভাবে একঘেয়ে কণ্ঠে কথাগুলো একটানা বলে থামল চ্যাঙ। তীক্ষ্ণ চোখজোড়া রানার মুখের প্রতিটা ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করল অপলক নেত্রে। তারপর ধীরে চোখ ফেরাল মায়ার দিকে।

চুপ করে থাকল রানা। কি বলবে সে? সব ধরা পড়ে গেছে, এখন মিথ্যে গল্প বানিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

'কি? চুপ করে রইলে কেন? বলো? সবকথা বলতে হবে তোমাকে। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস আমার বিরুদ্ধে কি প্ল্যান নিয়েছে বলতে হবে তোমার। মায়ার কাছ থেকে আমাদের সম্পর্কে কতটা জানতে পেরেছ তা-ও আমার জানা চাই।'

কোনও কথা বলল না রানা। বোবার মত চেয়ে রইল শুধু। ভাবল, এ ব্যাপারে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের যে হাত আছে তা চ্যাঙের অনুমান। এখনও কিছুই জানে না সে। নইলে সাবমেরিনের কথাও বলে ফেলত। শুধু এই একটা ব্যাপারই গোপন আছে এখনও চ্যাঙের কাছে, বাকি সবই তার জানা। এদের নির্যাতনের পদ্ধতি কি? কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে সে? ঘড়ি দেখল—সাড়ে দশটা। যতক্ষণ ব্যাপারটা এর কাছ থেকে চেপে রাখা যায় ততই লাভ। দেড়ঘণ্টা পর্যন্ত পারবে না সে টিকে থাকতে?

'বোঝা যাচ্ছে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আঙুলটা বাঁকিয়ে নিচ্ছি তাহলে। কথা আদায় করবার ব্যাপারে লোবোর জুড়ি নেই। তাছাড়া ওর ব্যক্তিগত কিছু উৎসাহ আছে তোমার ব্যাপারে। কাজেই আর দুই মিনিটের মধ্যে সত্যি কথা স্বীকার না করলে ওর সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হব আমি।'

দুই মিনিট পর উঠে দাঁড়াল দস্যু চ্যাঙ।

'তুমি এখনও উপলব্ধি করতে পারছ না, যুবক, কি ভয়ঙ্কর মৃত্যুদণ্ড তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমরা দু'জনেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। কেউ ঠেকাতে পারবে না এই মৃত্যু। ভোর ছ'টার মধ্যেই পার্ল রিভারে ফেলে দেয়া হবে লাশ দুটো। কিন্তু সব কথা স্বীকার করলে এমন ধুঁকে ধুঁকে তিলে তিলে মরতে হত না। অনেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে। সহজ উপায়ে হত্যা করা হোত। দেখা যাক, তোমার মত পরিবর্তন হয় কি না। প্রথমে তোমার চোখের সামনে মায়াকে নির্যাতন করা হবে, তারপর ধরা হবে তোমাকে। মানুষের সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। আমি এখন বিশ্রাম করতে চললাম। এখনও ভেবে দেখো।'

পাঁচ সেকেণ্ড রানার চোখে চোখে চেয়ে রইল দস্যু চ্যাঙ। একটা অশ্রাব্য গালি বেরিয়ে এল রানার মুখ থেকে। কপালের ভ্রূকুটিতে রাগ প্রকাশ পেল চ্যাঙের। দেয়ালের কাছে দাঁড়ানো লোকটার হাত থেকে হান্টারটা নিল সে নিজ হাতে। কাছে এগিয়ে আসতেই একগাদা থুথু ছিটিয়ে দিল রানা ওর মুখের উপর। ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল চ্যাঙের মুখ। ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে নিল সে।

ওদিকে ছোট ছোট লোহার কাঁটা বসানো এক জোড়া চামড়ার গ্লাভ হাতে পরে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে লোবো। যেন মুষ্টিযুদ্ধে নামতে যাচ্ছে কারও বিরুদ্ধে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রথমবারের মত জ্ঞান হারাল রানা। দশ মিনিট পর আবার। তার বিশ মিনিট পর আবার

বারো

অন্ধকার।

মনে হচ্ছে কিভাবে যেন সমুদ্রের অতল গভীরে তলিয়ে গেছে রানা। হাঙ্গরেরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ওর দেহ। নোনা পানি লেগে জ্বালা করছে অসম্ভব রকম। শেষ চেষ্টাও কি একবার করে দেখবে না সে? কতখানি নিচে নেমে গেছে সে সমুদ্রের মধ্যে? এখান থেকে আবার ওপরে ওঠা যাবে তো?

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে ওর। মস্ত দুটো হাঙ্গর কামড়ে ধরল ওর দুই হাত। দুর্বলভাবে চেষ্টা করল সে হাত দুটো ছাড়াবার। কানের কাছে ফিস ফিস করে কেউ বলল, 'রানা! রানা!'

অনেক চেষ্টায় চোখ খুলল রানা। অন্ধকার কোথায়? একাগ্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে মায়া ওয়াং। দুই হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে সে। রানাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে টেনে উঠিয়ে বসাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। আবার ঝিমিয়ে আসছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল মায়া। আবার ডাকল, 'রানা!'

এবার যেন বুঝতে পারল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল। আহত জন্তুর মত মাথাটা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। হাত দুটো কাঁপছে থর থর করে। কোনমতে চার হাত পায়ের সাহায্যে পালাবার চেষ্টা করছে সে কারও কাছ থেকে। তিন হাত গিয়েই পড়ে গেল সে মেঝের ওপর।

'রানা! পালাতে হবে আমাদের, এক্ষুণি। হাঁটতে পারবে না?'

'দাঁড়াও,' নিজের মোটা কর্কশ গলা শুনে নিজেই একটু অবাক হলো রানা। মায়া শুনতে পায়নি মনে করে আবার বলল, 'দাঁড়াও, দেখছি।'

সারা অঙ্গে অসহ্য ব্যথা। সর্বশরীর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত ঝরছে। মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে যেন কেউ। হাত-পা নেড়ে চেড়ে দেখল, ভাঙেনি কিছু। দেখতেও পাচ্ছে, শুনতেও পাচ্ছে, কিন্তু নড়তে ইচ্ছে করছে না ওর। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ব্যথাটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে ভেতর থেকে। মৃত্যু হলে যদি এই ব্যথা থেকে রেহাই পাওয়া যেত তাহলে সে-ও বরং ভাল ছিল। দুটো স্পাইক বসানো বক্সিং গ্লাভস্ ভেসে উঠল চোখের সামনে—সেই সাথে একটা হান্টার উঠছে-নামছে।

চ্যাঙ আর লোবোর কথা মনে আসতেই বাঁচবার ইচ্ছেটা প্রবল হলো রানার। বলল, 'ওরা কোথায়?'

মায়া হাঁটু গেড়ে বসেছে পাশে। রানা দেখল মায়ার গায়েও কয়েকটা স্পাইকের ক্ষতচিহ্ন। উঠে বসল সে।

'ওরা এই দশ মিনিট আগে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। একটা টেলিফোন এসেছিল একটু আগে। ব্যস্ত হয়ে চলে গেছে। যে-কোনও মুহূর্তে আবার এসে পড়তে পারে। জলদি, রানা, পালাতে হবে আমাদের!'

'টেলিফোন এসেছিল কিসের?'

'ঠিক বোঝা গেল না। সাবমেরিন, ডিনামাইট এসব বলছিল ওরা। খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল চ্যাঙ। লোবোকে ডেকে কানে কানে কি পরামর্শ করে তিনজনই বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। আমি অনেকক্ষণের চেষ্টায় হাতের বাঁধন আলগা করে এনেছিলাম, চটপট সেটা খুলে তোমার বাঁধন খুলে দিয়েছি।'

সাবমেরিন, ডিনামাইট শুনেই রানা চট করে ঘড়ির দিকে চাইল। বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। অর্থাৎ ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই বাড়িটা ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই সাথে শেষ হয়ে যাবে তারা দু'জনও। কোনও সূত্রে এই খবরটা জানতে পেরেই সরে পড়েছে চ্যাঙ তার দলবলসহ। মায়ার শেষের কথাগুলো আর শুনতে পেল না সে। দ্রুত চিন্তা করে কর্তব্য স্থির করে ফেলল।

'এখান থেকে এক্ষুণি পালাতে হবে, মায়া। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে বাড়িটা। আমরাও মারা পড়ব। আমি তো হাঁটতে পারব না—তুমি এগোও, তোমার পেছন পেছন হামাগুড়ি দিয়ে আমিও চেষ্টা করব এগোতে। কোন্‌দিকে যেতে হবে এখন? কোন্ পথে সব চাইতে দূরে সরে যাওয়া যাবে এ বাড়ি থেকে?'

কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারল মায়া। বলল, 'আমার সব কিছু চেনা আছে। তুমি এসো আমার পেছন পেছন।'

কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা, হাঁটুতে খুব লাগছে। পায়ের পাতায় তো ওরা জখম করতে পারেনি—উঠে দাঁড়াতে পারলে হোত। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল রানা, মায়া ফিরে এসে সাহায্য করল ওকে। কয়েক মুহূর্ত চোখে শর্ষে ফুল দেখল রানা। একটু পরে আবার পরিষ্কার দেখতে পেল সবকিছু। বারোটা বাজতে আর তিন মিনিট বাকি। রানার কোমর জড়িয়ে ধরল মায়া। রক্তে ভেজা চটচটে একটা বাহু রাখল রানা মায়ার কাঁধে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

নাক-মুখ তোবড়ানো সাদা জাগুয়ারটা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। কোনমতে টেনে হিঁচড়ে তোলা গেল রানাকে ড্রাইভারের পাশের সীটে, স্টীয়ারিং ধরে বসল মায়া। স্টার্ট দিয়েই বাঁয়ে মোড় নিল গাড়িটা উল্কাবেগে।

'গেটটা ওদিকে না?' পেছন দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

'এদিকে আরেকটা গেট আছে। আর কয় মিনিট বাকি?'

এখনও ডিনামাইটের আওতার মধ্যে রয়েছে ওরা। রানা ঘড়ি দেখল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বাকি আছে।

'ওই ঢিবিটার আড়ালে চলে যাও, মায়া। আর সময় নেই। এক্ষুণি ফাটবে।'

ঢিবির আড়ালে গাড়ি থামিয়ে কানে আঙুল দিল দু'জন। পেছন ফিরে রানা দেখল তীব্র একটা নীল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল—তারপরেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ। ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠল মাটি। মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটা বড় পাথর গিয়ে পড়ল সামনের কোথাও। লাল হয়ে গিয়েছে পেছনের আকাশ।

'ছুটে চলো, মায়া। এক্ষুণি এই এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

ঢিবির আড়াল থেকে রাস্তায় উঠতেই দেখা গেল চারপাশ থেকে বিশ পঁচিশ জন লোক ছুটে যাচ্ছে বাড়িটার দিকে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ধ্বংসাবশেষের ওপর। কয়েকজন ফিরে চাইল এঞ্জিনের শব্দে। সাব-মেশিনগান তুলল। কিন্তু গুলি ছোঁড়ার আগেই ঢিবির আড়াল হয়ে গেল ওরা রাস্তাটা একটু বাঁয়ে মোড় নেয়ায়।

পেছনের গেটটা খোলা পাওয়া গেল। সাঁ করে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল গাড়ি। ঠিক এমনি সময় জ্বলে উঠল হেড় লাইট। চমকে ফিরে দেখল রানা দেয়ালের গা ঘেঁষে এতক্ষণ ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল একটা ট্রাক। ওদের বেরুতে দেখেই

রওনা হলো পেছন পেছন।

একবার ঘাড় ফিরিয়ে ট্রাকটার দিকে চেয়েই ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল মায়ার মুখ। বলল, 'চ্যাঙ! রানা, চ্যাঙ আছে ওর মধ্যে!'

পর পর তিনটে গুলির শব্দ শোনা গেল। ক্র্যাক, ক্র্যাক, ক্র্যাক। হু-হু করে বাতাস কেটে এগিয়ে চলল জাগুয়ার। প্রচণ্ড হাওয়ার তোড়ে চুলগুলো নিশানের মত উড়ছে মায়ার। গগল্‌স্‌ নেই। ভাঙা উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে অসংখ্য পোকা মাকড় এসে পড়তে থাকল চোখে মুখে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে চলল মায়া। কিন্তু পঞ্চাশের বেশি স্পীড তুলতে পারছে না সে কিছুতেই। দৈত্যের মত ছুটে আসছে প্রকাণ্ড দশ চাকার বেডফোর্ড ট্রাক।

সামনের ড্যাশ বোর্ড হাতড়ে দেখল রানা। কোনও অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গেল না। নিরুপায় অবস্থায় ছটফট করতে থাকল সে। এদিকে বাতাসের চাপে দম বন্ধ হবার জোগাড়। পোকাগুলো থেকে বাঁচবার জন্যে মাঝে মাঝে লাইট নিভিয়ে দিচ্ছে মায়া। কিন্তু পরক্ষণেই জ্বালতে হচ্ছে আবার। ল্যাম্প পোস্টগুলোর আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। মাথার ওপরে আধখানা চাঁদের আলোয় এত স্পীডে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়।

'নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আমাদের পেছনে লাগল কেন ওরা আবার?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'গুপ্তধনের সন্ধান জানি যে আমরা। আমাদেরকে শেষ না করে পালিয়েও স্বস্তি নেই চ্যাঙের। অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে ওরা। অল্পক্ষণেই ধরে ফেলবে।'

বহুদূর চলে এসেছে ওরা চ্যাঙের আস্তানা থেকে। ডাইভারশনগুলো এলেই মায়া একটু পিছিয়ে পড়ে। কাঁচা হাত, ছকছাড়া ট্রাক সেখানে ফুল স্পীডে চলে। আবার পাকা রাস্তায় উঠে দূরত্ব বাড়িয়ে নিচ্ছে মায়া।

হঠাৎ পেট্রল ইণ্ডিকেটারের দিকে চেয়েই আঁতকে উঠল মায়া।

'আর আধ গ্যালন পেট্রল আছে, রানা। ধরা পড়ে গেলাম! কিছু একটা বুদ্ধি বের করো, নইলে বাঁচবার আর কোনও পথ নেই।' কান্নার মত শোনাল মায়ার গলাটা।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা চলবার পর একটা 'গ' টার্ন নিয়ে উঁচুতে উঠছে গাড়িটা। তার মানে খুব সম্ভব আরেকটা ডাইভারশন। পাঁচ-ছয়শো গজ পেছনে পড়ে গেছে ট্রাকটা।

ঠিক। কিছুটা ওপরে উঠেই ডাইভারশন পাওয়া গেল। দুটো খুঁটির মাথায় মস্ত বড় সাইনবোর্ডে চীনা ও পর্তুগীজ ভাষায় সাবধান করা হয়েছে। তীর-চিহ্ন দিয়ে ডাইভারশন দেখানো আছে। শহরের মধ্যে অনেকগুলো ব্রিজে তুমুল কাজ চলছে বলে এই ডাইভারশন। প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে কাজ—বর্ষার আগেই কাজ শেষ না করলে খালে পানি এসে যাবে, এ বছর আর শেষ করা যাবে না তাহলে ব্রিজগুলো। সরু ডাইভারশন নেমে গেছে নিচে—প্রায় শুকিয়ে যাওয়া খালের ওপর খান কয়েক তক্তা ফেলে পার হবার ব্যবস্থা।

পেছনের উজ্জ্বল হেড লাইট অদৃশ্য হলো বাঁক ঘুরতেই। এমন সময় বার দুই নক্‌ করে গলা খাঁকারি দিল জাগুয়ারের এঞ্জিন।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল রানা, 'থামো!'

গাড়ি থামাল মায়া ঠিক ডাইভারশনের মুখে। দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল রানা রাস্তার ওপর। মায়াও নামতে যাচ্ছিল, রানা বলল, 'তুমি এসো না। নিচে নেমে গিয়ে লাইট নিভিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো। শেষ চেষ্টা করে দেখি।'

একটিও কথা না বলে মায়া নেমে গেল ডাইভারশনের পথ ধরে নিচে। লাইট নিভিয়ে দিতেই কয়েক পা হেঁটে ফিরে এল রানা সাইনবোর্ডের কাছে। দুটো বাঁশ পুঁতে টাঙানো হয়েছে নোটিশ। বড় করে লাল কালিতে তীর চিহ্ন আঁকা। শরীরটা অসম্ভব দুর্বল লাগছে। সমস্ত মনের জোর একত্র করে রানা নোটিশ বোর্ডটা ধরে হেঁচকা টান দিল। দুটো দড়ি ছিঁড়ে খসে এল সেটা।

এমন সময় বাঁকটা পুরোপুরি ঘুরতেই আবার দেখা দিল হেডলাইট। নোটিশটা নিয়ে লুকিয়ে পড়ল রানা রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে। একবার ভাবল, কাজ হবে এতে? পরমুহূর্তেই দূর করে দিল চিন্তাটা। যা হবার হবে।

প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে ট্রাকটা। আর মাত্র পঁচিশ গজ আছে। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করে রইল রানা। সাঁ করে চলে গেল ট্রাক পূর্ণ বেগে রানার সামনে দিয়ে। একরাশ ধুলোবালি পড়ল ওর চোখমুখে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চেয়ে রইল রানা বিলীয়মান ব্যাকলাইটের দিকে। উঠে গেল গাড়িটা ব্রিজের ওপর। তারপরেই কানে এল দশটা টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। সামনে ফাঁকা দেখতে পেয়ে ব্রেক করেছে ড্রাইভার প্রাণপণে। গাড়িটা প্রায় থেমে এসেছিল, কিন্তু সামনের চাকা দুটো ততক্ষণে গিয়ে পড়েছে অন্ধকার গহ্বরে।

লাফিয়ে উঠল রানার বুকের ভেতরটা। আনন্দের আতিশয্যে ভুলে গেল ওর নির্যাতিত দেহের কথা। ঝোপ থেকে বেরিয়েই ছুটল সে গাড়িটার দিকে।

সামনের টানে মাঝের দু'জোড়া চাকাও চলে গেল গহ্বরের মধ্যে। এবার ঠিক ডিগবাজি খাওয়ার মত করে দ্রুত চলে গেল সবটা দেহ দৃষ্টির আড়ালে। প্রথম পড়ল গিয়ে পনেরো ফুট বাই পনেরো ফুট জায়গা জুড়ে যে নতুন পিলারটা তৈরি হচ্ছে তার ওপর। প্রচণ্ড ধাতব শব্দ আরও জোরে শোনাল মস্ত ব্রিজের ওপর থেকে। সেখান থেকে আবার কাত হয়ে পড়ল ট্রাকটা মাটিতে। আশ্চর্য, বাতি দুটো জ্বলছে এখনও।

প্রথম ধাক্কাতেই আগুন ধরে গিয়েছিল, এবার মস্ত পেট্রল ট্যাঙ্ক বার্স্ট করল। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠে মিনিট দু'য়েক আড়াল করে রাখল পুরো ট্রাকটাকে। চারপাশে দাউ-দাউ করে উদ্বাহু নৃত্য করছে আগুনের লেলিহান শিখা। চোখে মুখে আগুনের হল্কা লাগতেই মাথাটা সরিয়ে আনল রানা। পোড়া মাংসের গন্ধ সোজা উঠে এল ওর নাকে। দম বন্ধ করে আগুনের হল্কা বাঁচিয়ে দেখবার চেষ্টা করল রানা ট্রাকের যাত্রীদের বর্তমান অবস্থা। কিছুই দেখা গেল না।

এমনি সময়ে কাঁধের ওপর কার হাত পড়তেই চমকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। মায়া এসে দাঁড়িয়েছে কখন টের পায়নি সে। পরনে ছেঁড়া জামা-কাপড়—গা দেখা যাচ্ছে। নিজের রক্ত ভেজা বুশ শার্টটা খুলে পরিয়ে দিল রানা ওর গায়ে। বলল, 'বেশ মানিয়েছে কিন্তু।'

'ও কি, রানা? পড়ে যাচ্ছ যে!' দু'হাতে ধরল মায়া রানার জর্জরিত দেহ। ঢলে

পড়ল রানা মেটাল রোডের ওপর।

এমনি সময় দেখা গেল আরেক জোড়া উজ্জ্বল হেড লাইট। এগিয়ে আসছে ওদের দিকে বাঁকটা ঘুরেই। পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে রাস্তার ওপর বসে রইল মায়া রানার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে।

তেরো

এর পরের ঘটনাগুলো রুটিন মাফিক। জীপ থেকে লাফিয়ে নামল চারজন সামরিক পোশাক পরিহিত চীনা অফিসার। রানার সম্পর্কে আলাপ করল মায়ার সাথে অত্যন্ত ভদ্রভাবে। পুলের উপর টর্চ জ্বেলে দেখল ট্রাকটার ভস্মাবশেষ। একজন ডাইভারশনের নোটিশটা ঠিক জায়গা মত বেঁধে দিল আবার। সযত্নে তোলা হলো জীপে রানার জ্ঞানহীন দেহ। মায়া উঠে বসল পাশে। তারপর হাসপাতাল। সর্বাঙ্গে ডেটল, সার্জিক্যাল টেপ, ইনজেকশন। সেখান থেকে সোজা নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে ম্যাকাও হেলি-পোর্টে। ফু-চুং-কে আগেই নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে।

ওয়্যারলেসে হংকং, সাংহাই আর বেইজিং-এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিশেষ নির্দেশ এসেছে অ্যাডমিরাল হো হুয়ের কাছ থেকে। হংকং এ চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের একটা গোপন আস্তানায় নিয়ে আসা হয়েছে ওদের লুকিয়ে।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার।

ওকে নড়ে চড়ে উঠতে দেখেই বিছানার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মায়া। কয়েকজন অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে বিছানার পাশে। চোখ খুলে ওদের দিকে চাইল রানা। স্যালিউট করল ওরা রানাকে। ওদের কাঁধের কাছে জামার উপরের সামরিক চিহ্নগুলো দেখল রানা। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। তারপর পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে। দুই দিন দুই রাত অক্লান্ত সেবা করল মায়া দুঃসাহসী স্পাইটিকে সারিয়ে তোলার জন্যে।

বাম হাতটা বুকের কাছে, গলায় ঝোলানো একটা গোল ফিতের ওপর আলগাভাবে রাখা—তাছাড়া হাবে ভাবে আর কোনও পরিবর্তন নেই—আকর্ণ হাসি, দুষ্টামি ভরা দুই চোখ, আর ডান হাতে একটা চামড়ার ভারি ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকল শ্রীমান ফু-চুং, কোন রকম সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়েই।

আপন মনে রানার চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল মায়া ওয়াং—চট করে সরে দাঁড়াল।

'কিরে, শালা? ব্যাগে কি?' জিজ্ঞেস করল রানা সোফার ওপর নড়ে বসে।

'তোর বিয়ের যৌতুক।' বলেই টেবিলের ওপর ব্যাগটা সযত্নে নামিয়ে রেখে একটা সোফা অধিকার করল সে। 'এক কাপ কফি খাওয়াবে, মায়া দি?'

সুন্দর বিকেল। কাঁচের জানালা দিয়ে দূর সমুদ্রে ছবির মত দেখা যাচ্ছে একটা

নোঙর ফেলা জাহাজ। মাথায় ফেনা নিয়ে ভেঙে পড়ছে ঢেউগুলো তীরে এসে। কয়েকটা সী-গাল উড়ছে ঘুরে ঘুরে। মায়া চলে গেল ঘর ছেড়ে। পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিল ফু-চুং।

ইংরেজিতে টাইপ করা একটা চিঠি। ওপরে গণ চীনের সরকারী সীলমোহর। রানা পড়ল চিঠিটা:

জনাব মাসুদ রানা,
আপনার দ্বারা গণচীন সবিশেষ উপকৃত হয়েছে।
আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতা আমাদের মুগ্ধ,
বিস্মিত ও চমৎকৃত করেছে।
অসংখ্য ধন্যবাদ।
আমাদের দু'দেশের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হোক।

অ্যাডমিরাল হো ইন।

পুনশ্চ: আপনার জন্য একটি ক্ষুদ্র উপহার পাঠালাম।
জিনিসটির নাম ম্যাজিক ফরটিফোর।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে একবার ব্যাগটার দিকে চাইল রানা। এরই মধ্যে আছে রাহাত খানের এতদিনকার স্বপ্ন, সেই ম্যাজিক ফরটি-ফোর। এটা নিয়ে গিয়ে যখন বুড়োর হাতে তুলে দেবে, তখন তাঁর চেহারাটা কেমন হবে কল্পনা করবার চেষ্টা করল সে একবার।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ফু-চুং-এর চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক।

'এক ঢিলে দুটো মূল্যবান পাখি মেরে নিয়ে যাচ্ছিস, দোস্ত, এই কিস্তিতে। হিংসে হচ্ছে আমার।'

'একটা তুই রেখে দে না,' বলল রানা।

'দিদি ডেকে ফেলেছি যে!'

হাসল রানা। 'নারে, তুই যা ভাবছিস, সে-সব কিচ্ছু না। ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছি আমি ওকে ওর মামার কাছে পৌঁছে দেব বলে। এখানে ওর কেউ নেই।'

'তাই বুঝি? বেশ তো। এখন মায়া কফি নিয়ে আসবার আগেই কয়েকটা জরুরী কথা সেরে নিতে হবে আমাদের। তোর ইচ্ছেমত আমরা তোদের দু'জনের জন্যে দুটো কেবিন বুক করেছি জাহাজে। ঢাকায় তোদের চীফকেও জানানো হয়েছে যে তুই জাহাজে ফিরছিস দেশে। তাঁরও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি তোর এই জাহাজে যাওয়াটা মোটেই সমর্থন করতে পারছি না, দোস্ত। জাহাজ একদম নিরাপদ নয়। তোকে এত গোপনে এত সতর্কতার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে কেন জানিস?'

'না তো!'

'তোদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে ওরা। ওদের পাঁচ হাজার মেম্বারের প্রত্যেকের কাছে তোদের দু'জনের ফটো দেয়া হয়েছে। জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে এক লক্ষ হংকং ডলার পুরস্কার। সহজে ছেড়ে দেবে না ওরা। প্রচণ্ড ক্ষমতা ওদের। আশ্চর্য কৌশলে ল্যাংফু-কে মুক্ত করে নিয়ে গেছে ওরা হংকং পুলিসের হাত থেকে। অথচ তিনটে খুনের জেল পালানো আসামী সে। ওদের ক্ষমতাটা বুঝতেই

পারছিস। আমরা সাধ্যমত গোপনীয়তার সঙ্গে জাহাজে তুলে দেব তোকে ঠিকই, কিন্তু তারপর যদি কোন বিপদ হয়, তখন?'

'বাদ দে ওসব দুশ্চিন্তা। আমাদের কি অত চিন্তা করলে চলে? তোর-আমার কারবারই তো বিপদ নিয়ে।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল ফু-চুং। তারপর বলল, 'ঠিক হ্যায়। তাহলে আজই সন্ধ্যার পর জাহাজে উঠতে হবে তোদের। তৈরি থাকিস। আর জাহাজে কোনও রকম অসুবিধে দেখলে ওয়্যারলেসে জানাবি আমাদের বিনা দ্বিধায়।'

কফির কাপ শেষ করে বিদায় নিল ফু-চুং। আজই সে ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল রানা। হঠাৎ এক হাতে জড়িয়ে ধরল ফু-চুং রানাকে। রানাও ধরল ওকে জড়িয়ে। দুই নির্ভীক বন্ধু একে অপরের প্রাণস্পন্দন অনুভব করল অন্তরঙ্গ ভাবে।

'আবার দেখা হবে,' বলে বেরিয়ে গেল ফু-চুং। রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়িতে উঠে কয়েক সেকেণ্ডেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে যান-বাহনের ভিড়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে এল রানা ওর কামরায়।

সন্ধ্যার পর দু'জনকে যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গে গ্যাঙওয়ের সিঁড়ি দিয়ে তুলে দেয়া হলো জাহাজে। মায়াকে ওর কেবিনে পৌঁছে দিয়ে নিজের কেবিনে চলে গেল রানা। 'এন' ডেকে ওদের কেবিন।

কিন্তু কেউ লক্ষ করল না, গ্যাঙওয়ের মুখে রানা ও মায়াকে দেখে একজন খালাসী দ্রুত নেমে গিয়ে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদে ঢুকল।

ঠিক তিন ঘণ্টা পর দু'জন চীনা ব্যবসায়ীকে নামিয়ে দেয়া হলো ডকইয়ার্ডে একখানা কালো গাড়ি থেকে। কাস্টমস্ এবং ইমিগ্রেশনের ঝামেলা চুকিয়ে ঠিক সময় মত উঠে পড়ল ওরা জাহাজে। আর একটু দেরি হলেই ছেড়ে দিত জাহাজ।

একজন ব্যবসায়ীর চেহারা জুজুৎসু ব্ল্যাক-বেল্টের মত। উঁচু হয়ে ফুলে আছে বুকের পেশী। পায়ে হকি কেডস্। ব্রিফ কেসের ওপর নাম লেখা: মিস্টার ল্যাংফু।

দ্বিতীয়জন অসম্ভব মোটা। প্রকাণ্ড পেট হাতখানেক বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। দরদর অবিরল ধারায় ঘামছে সে, আর তোয়ালের মত একটা রুমাল দিয়ে ঘাড়, মুখ মুছছে। তার অ্যাটাচি কেসের ওপর লেখা: মিস্টার ডব্লিউ স্মি লোবো।

চোদ্দ

রাত দশটায় ছাড়ল জাহাজ লম্বা করে সিটি বাজিয়ে।

রিপোর্ট লিখছিল রানা হেড অফিসের জন্যে। এটাকে কোডে পরিণত করে আজই রাতে পাঠিয়ে দেবে জাহাজের ওয়্যারলেসে ঢাকায়। কলম উঁচু করে কান পেতে শুনল রানা জাহাজের বাঁশী। কেঁপে উঠল প্রকাণ্ড জাহাজটা কয়েকবার।

রিপোর্ট শেষ করে টেলিফোন তুলে নিল রানা।

'কেমন লাগছে, মায়া?'

'খুব খারাপ! চলার শুরুতেই বমি বমি লাগছে। আরও এগোলে যে কি হবে তা ভেবেই আমি ভয়ে অস্থির।'

'প্রথম তিনদিন বমি করে কাটাতেই হবে। তারপর কেটে যাবে এই অবস্থা। এই ক'দিন কেবিনে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকো, আর কিছুই করবার নেই। তাছাড়া বাইরে বেরোনো ঠিকও না। যতটা আড়ালে থাকা যায় ততই ভাল। আমাদের পেছনে টং-এর কোনও লোক লেগেছে কিনা কে জানে।'

'তোমার অবস্থা কি রকম?'

'তোমারই মত।'

'তাহলে ঠিক আছে। বিছানায় পড়ে থেকেও সান্ত্বনা পাব—তুমি ফুর্তি করে বেড়াতে পারছ না জাহাজময় আমাকে ছাড়া। রোজ টেলিফোন করবে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

খেয়ে নিল রানা। বয় বেরিয়ে যেতেই দরজা লক্ করে দিল। ভাবল, সাড়ে তিন হাজার যাত্রী নিয়ে একটা ছোটখাট শহর ভেসে চলেছে পানির ওপর দিয়ে। স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটবে এই কয়দিনের মধ্যে। চুরি হবে, মারামারি হবে, রাগ, হিংসা, মাতলামি, ঠগবাজি, সব হবে। এক আধটা নতুন জন্মও হতে পারে, আত্মহত্যা, এমন কি খুনও অসম্ভব নয়।

মুচকি হেসে ভাবল রানা এতগুলো জানোয়ার একসঙ্গে থাকলে কিন্তু এত গোলমাল হত না।

চারদিনের দিন অনেকটা সুস্থ বোধ করল মায়া। টেলিফোনে ঠিক হলো সন্ধের সময় একসাথে লাউঞ্জে বসে ডিনার খাবে ওরা।

কোণের একটা টেবিল বেছে নিল রানা। কথার খৈ ফুটল মায়ার মুখে। অনেকক্ষণ বকর বকর করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মায়া, 'আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ, রানা?'

'আমি কি জানি? তুমিই তো নিয়ে চলেছ আমাকে। তোমার সাথে না গেলে চ্যাঙকে বলে দেবে—কেবল সেই ভয়েই না যাচ্ছি আমি!'

'ঠাট্টা নয়। সত্যি করে বলো তো? এই কয়দিন দিনরাত ভেবেছি আমি। কোনও উত্তর পাইনি। কোথায় চলেছি আমি তোমার সাথে? যে মামা জীবনে দেখেনি আমাকে, কিভাবে গ্রহণ করবে সে আমাকে?'

রানা বুঝল খুব সিরিয়াস হয়ে গেছে মায়া। বলল, 'আপাতত রেড লাইটনিং টং-এর খপ্পর থেকে বেরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছ তুমি। তারপর তোমার একটা সুব্যবস্থা হয়েই যাবে। নিজের ভেতর থেকেই উত্তর পেয়ে যাবে, মায়া। কারও বলে দিতে হবে না কোথায় যাবে, কি করবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মায়া। রানার একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। অর্থহীন ভাবে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। সাদা শানটুং সিল্কের শার্ট আর ছাই রঙের স্কার্টে অপূর্ব সুন্দর লাগছে মায়াকে।

'চিরজীবনের জন্যে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম তোমার কাছে,' হঠাৎ বলে ফেলল মায়া। 'আমি জানতাম না, তোমার মতন মানুষ আছে এই দুনিয়ায়। আমি…'

'ওরেব্বাপস্!' আঁৎকে উঠল রানা। 'বেশি বোলো না, মায়া, পেট ফেটে মরে যাব। আমার আবার প্রশংসা হজম হয় না।'

স্টুয়ার্ড এগিয়ে আসতেই হাতটা ছেড়ে দিল মায়া। ডিনারের কথা বলল রানা। একটা নোট বইয়ে অর্ডার লিখে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে চলে গেল সে অন্য টেবিলে।

অল্পক্ষণেই জমে উঠল গল্প। নিজেদের জীবনের নানান টুকিটাকি কথা। রানার কি একটা কথায় হেসে উঠেই হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল মায়া। যেন ভূত দেখেছে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল বিস্মিত রানা।

কয়েক সেকেণ্ড কোনও কথাই বলতে পারল না মায়া। তারপর রানার পিছনে দেয়ালের ও-পাশটা আঙুল দিয়ে দেখাল, 'ওই, ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল লোবো! আমি চাইতেই সরে গেল!'

'কি যা-তা বলছ?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল রানা। একহাত ধরে টেনে রাখল ওকে মায়া। একা বসে থাকবার কথা ভাবতেও পারে না সে।

'ভয় লাগছে। আমাকে একা রেখে কোথায় যাচ্ছ?'

রানা বুঝল দেরি হয়ে গেছে। যদি ঘটনাটা সত্যিও হয়, ওখানে আর কাউকে পাওয়া যাবে না। বসে পড়ল সে আবার। বলল, 'চোখের ভুল হয়েছে তোমার।'

'অসম্ভব! কিছু একটা দেখেছি নিশ্চয়ই। লোবোর প্রেতাত্মা নয়তো?'

হেসে ফেলল রানা। ডিনার এসে গেছে। চুপচাপ খেয়ে নিল ওরা। রানা লক্ষ্য করল মন থেকে লোবোর প্রেতাত্মার ভয় তাড়াতে পারছে না মায়া কিছুতেই। ভাল করে খেতেও পারল না সে। বেশির ভাগই পড়ে থাকল ডিশে, প্লেটে। কেমন যেন ঠাণ্ডা, নির্জীব হয়ে গেছে মায়া ভয়ে।

'খুব ভয় পেয়েছ, মায়া?' মায়ার কাঁধে হাত রাখল রানা।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না মায়া। তারপর বলল, 'আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো, রানা। এখানে ভাল লাগছে না।'

আর কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল হলঘর থেকে। অবজারভেশন লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে কফি খেলো ওরা। রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল সাগরের দীর্ঘনিঃশ্বাস। তারপর মায়ার কেবিনে ওকে পৌঁছে দিয়ে রাত দশটার মধ্যেই ফোন করবে কথা দিয়ে নিজের কেবিনে চলে এল রানা।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবছে রানা। সত্যিই তো, ঢাকার এক চাইনিজ রেস্তোরাঁর মালিক মায়ার মামা—যদি মায়াকে নিতে অস্বীকার করে? তাহলে? মেয়েটাকে ঢাকায় টেনে নিয়ে যাওয়া ভুল হচ্ছে না তো? নাহ। দস্যু চ্যাঙের গুপ্তধন এখন মায়ার। কোটি কোটি টাকা। ভালই কাটবে ওর জীবন।

বেজে উঠল টেলিফোন। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল রানা। 'কি ব্যাপার, মায়া?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি ওয়্যারলেস অপারেটার বলছি, স্যার,' মোটা পুরুষ কণ্ঠ।

'বলুন, কি ব্যাপার?' এক সেকেণ্ডে সামলে নিল রানা নিজেকে।

'আপনার নামে একটা সাইফার সিগন্যাল এসেছে, স্যার। মোস্ট ইমিডিয়েট। পড়ে শোনাব না পাঠিয়ে দেব, স্যার?'

সাইফার সিগন্যাল আবার কোত্থেকে এল? একটু থেমে রানা বলল, 'পাঠিয়ে দিন। আমি ঘরেই আছি। ধন্যবাদ।'

জ্বালাতন! কিন্তু এই অসময়ে সাইফার সিগন্যাল কেন? কার কাছ থেকে? মনের ভেতর কেন জানি একটা অ্যালার্ম বেল বেজে উঠল রানার। মনে হলো নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ।

দরজায় টোকা পড়তেই উঠে গিয়ে কেবল্‌টা নিয়ে এসে বসল রাইটিং টেবিলের সামনে। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের মেসেজ। ক্যান্টন থেকে এসেছে। ডি-সাইফার করলে দাঁড়ায়:

আপনার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে মিস্টার লোবো এবং ল্যাংফু একই জাহাজে আপনাদের সহযাত্রী। তাদের কাছে আপনাদের দু'জনেরই লাইফ ইনশিওর করিয়ে নেবেন। তিন ঘণ্টার মধ্যে আমরা বাকি ব্যবস্থা করিছ। সি. এস. এস.

কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল রানা। তাহলে সত্যি সত্যিই লোবোকে দেখেছিল মায়া। ল্যাংফু-ও আছে সাথে। তিন ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই চাইনিজ হেলিকপ্টার আসছে। জোর করে ল্যাণ্ড করবে জাহাজের ওপর। দ্রুত রিসিভার তুলে নিল রানা। এক্ষুণি মায়াকে সাবধান করা দরকার।

'মিস্ মায়া ওয়াং-কে দিন,' টেলিফোন অপারেটারকে আদেশ দিল রানা।

রিংগুলো শুনতে পাচ্ছে সে। একবার বাজল। দু'বার, তিনবার, চারবার।

খটাং করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল রানা কেবিন থেকে। বিশটা কামরার পরেই মায়ার কেবিন। কেউ নেই ঘরে। খাঁ-খাঁ করছে শূন্য ঘর। বিছানার চাদরে ভাঁজ পড়েনি একটাও। আলো জ্বলছে। একমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পড়ল রানার—একটা চেয়ার উল্টানো। ঘরের মধ্যে কেউ লুকিয়ে ছিল আগে থেকেই। ধস্তাধস্তি হয়েছে। তারপর?

পোর্টহোলের দিকে চোখ গেল রানার। বন্ধ। তারপর বাথরুমটাও ঘুরে এল। না, কেউ নেই।

মাথাটা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল রানা। লোবো বা ল্যাংফু-র অবস্থায় রানা হলে কি করত? খুন করবার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর বের করবার চেষ্টা করত। গুপ্তধনের সন্ধান জানবার জন্যে নির্যাতন করত। ওকে নিয়ে যেত নিজের কেবিনে, উত্তর বের করবার সময় যেন কোনও ব্যাঘাত না হয়।

নিশ্চয়ই মায়াকে ওরা নিজেদের ঘরে নিয়ে গেছে। পথে কেউ দেখে ফেললে চোখ টিপে মাথা নেড়ে বলেছে, 'মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছে শ্যাম্পেনের। না, না, ধন্যবাদ, আমি একাই পারব।' কিন্তু কার ঘরে নিয়ে গেছে। ল্যাংফু না লোবো? কতক্ষণ আগে?

দৌড়ে নিজের কামরায় ফিরে এল রানা। দশটা বাজে।

অ্যালার্ম বাজাবে নাকি সে? ক্যাপ্টেনকে জানাবে? তাহলে একগাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, দেরি হবে। জাহাজের সার্জেন্ট এই অসম্ভব কথা শুনে প্রথমেই ওকে মাতাল ঠাওরাবে, ঈর্ষাকাতর প্রেমিকও ভাবতে পারে। ওকে ঠাণ্ডা করবার

জন্যে বলরে, 'নিশ্চই, নিশ্চই। আপনি যা বলছেন তা যদিও খুবই অসম্ভব মনে হচ্ছে—আমাদের যতদূর সাধ্য আমরা নিশ্চই করব। আপনি নিজের কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম করুন গিয়ে, আমরা দেখছি।'

কেবিনের দরজা বন্ধ করেই ছুটে গিয়ে ড্রয়ার থেকে প্যাসেঞ্জারস্ লিস্ট বের করল রানা। এই তো। মিস্টার ল্যাংফু আর মিস্টার ডাব্লিউ. সি. লোবো! ছি ছি, আগে কেন দেখেনি সে লিস্টটা?

বি-৬৩—নিচের ডেকের ফার্স্ট-ক্লাস কেবিন। একই কেবিনে দু'জন। লোবো আর ল্যাংফু! দুই বন্ধু।

যন্ত্রচালিতের মত সুটকেস খুলে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের দেয়া ল্যুগার পিস্তলটা বের করল রানা। সাইলেন্সার পাইপটা লাগিয়ে নিল পেঁচিয়ে। টিকিটের সঙ্গে পাওয়া জাহাজের নক্সাটা মেলে ধরল টেবিলের ওপর। সেই সাথে তার মাথার মধ্যে একশো মাইল স্পীডে চলল চিন্তা। এই তো বি-৬৩! আশ্চর্য! ঠিক ওর নিচের ঘরটাই।

গুলি করে তালা ভাঙবে? তারপর দু'জনকে গুলি করবে? নাহ্। তার আগেই শেষ হয়ে যাবে সে নিজে। তাছাড়া ওরা তালা তো লাগিয়েছেই বল্টুও নিশ্চয়ই লাগিয়ে দিয়েছে দরজার।

কয়েকজন লোককে ডেকে জড়ো করবে নাকি তাহলে?

কিন্তু তাতেও লাভ হবে না কিছুই। দরজায় ধাক্কা পড়লেই পোর্টহোল দিয়ে সাগরে ফেলে দেবে ওরা মায়াকে। তারপর বিরক্ত মুখে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করবে, 'কি ব্যাপার? এত হইচই কিসের?'

কোমরে গুঁজে নিল রানা পিস্তলটা। তারপর খুলে ফেলল পোর্টহোলের ঢাকনা। কাঁধটা ঢুকিয়ে দেখল আরও ইঞ্চি দুয়েক জায়গা খালি থাকে। নিচের দিকে চেয়ে দেখল। ফুট দশেক নিচে একটা আবছা আলোর বৃত্ত দেখা যাচ্ছে। বি-৬৩-র পোর্টহোল। ধরা পড়ে যাবে নাকি রানা ব্রিজের 'ডেকা রাডার'-এ?

বিছানার পাশে ফিরে এসে একটানে চাদর তুলে নিল রানা। দুই টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল সেটা। দুই মাথা গিঁট দিয়ে নিল শক্ত করে। পেঁচিয়ে দড়ি পাকিয়ে নিল সেটাকে। যদি ঢুকতে পারে, বি-৬৩ থেকে একটা চাদর নিয়ে ফিরবে। আর যদি হেরে যায় তবে তো কোনও কথাই নেই। জুতো জোড়া খুলে ফেলল রানা পা থেকে।

সর্বশক্তি দিয়ে টেনে দেখল একবার চাদরটা। না, ছিঁড়বে না। পোর্টহোলের আঙটার সাথে চাদরের একমাথা বাঁধতে বাঁধতে ঘড়ির দিকে চাইল রানা।

দশটা পাঁচ। বেশি দেরি হয়ে গেল না তো? দড়িটা ঝুলিয়ে দিল সে পোর্টহোলের বাইরে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে মাথাটা ঢুকিয়ে দিল গর্তের মধ্যে। ধীরে ধীরে বাকি দেহটা এবং সবশেষে পা দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল ওর গর্তের বাইরে।

নিচের দিকে চেয়ো না। চিন্তা কোরো না। আদেশ দিল রানা নিজের মনকে। কিন্তু মন কি তাই শোনে? বহু নিচে শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের জলকল্লোল। ছলাত্ ছলাত্—হিস্স্, হিস্স্। মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে রানার দেহটা, ধাক্কা খাচ্ছে

জাহাজের গায়ে। ধীরে ধীরে নামছে সে সাবধানে।

রশিটা ওর ভার সহ্য করতে পারবে তো? সন্দেহ জাগে। ভেবো না, এসব কথা এখন ভাববার কি দরকার? ক্ষুধার্ত সমুদ্র অপেক্ষা করে আছে নিচে। থাক না। চোখা স্ক্রুগুলো দেহটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দেবে হাত ফস্কালে। হাত ফস্কাবে কেন? তুমি একটা কিশোর। পেয়ারা গাছে উঠেছ। পড়ে গেলে আর কি হবে? পাঁচ হাত নিচেই আছে নরম মাটি আর ঘাস। কতবারই তো পড়েছ, কি হয়েছে? কিছুই না।

চিন্তাটা দূর করে দিল রানা। বাইসেপের পেশী দুটো থরথর করে কাঁপছে। আর বেশিক্ষণ এভাবে ঝুলে থাকা সম্ভব নয়।

বাম পা-টা ঠেকল কিসের সঙ্গে। হ্যাঁ। পোর্টহোলের বাইরের রিম। ধীরে ধীরে নেমে এল রানা আরও নিচে। পর্দা ঝুলছে পোর্টহোলের মুখে। রিমের ওপর ভর দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল রানা। নিচে গর্জন করছে চীন সাগর। প্রকাণ্ড জাহাজের গা পিঁপড়ের মত চিমটি কেটে ধরে ঝুলছে যেন সে। পর্দার ওপাশে মায়ার কি অবস্থা কে জানে।

পুরুষ কণ্ঠে কেউ কিছু বলল ঘরের মধ্যে। বোঝা গেল না।

'কিছুতেই বলব না!' তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠ।

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপরই চটাস্ করে চপেটাঘাতের জোর আওয়াজ। ঠিক পিস্তলের আওয়াজের মত। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল রানা ভেতরে মাথা নিচের দিকে করে। কিসের ওপরে গিয়ে পড়বে কে জানে? বাম হাতে মাথাটা আড়াল করল সে আর ডান হাতে টেনে বের করল পিস্তলটা শূন্যে থাকতেই।

পোর্টহোলের নিচে রাখা একটা স্যুটকেসের ওপর পড়েই ডিগবাজি খেয়ে ঘরের মাঝ বরাবর উঠে দাঁড়াল রানা। ডান হাতের তর্জনীটা ট্রিগারের ওপর চেপে থাকায় নখটা সাদা হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা দুই চোখ দু'জনের দিকে চাইল একবার করে। পিস্তলটা দু'জনের ঠিক মাঝখানটায় তাক করে আছে। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। বুঝল অবস্থাটা এখন ওর আয়ত্তাধীন, এবং এটাকে আয়ত্তেই রাখতে হবে।

'খবরদার!' সাবধান করল রানা ওদের।

'তোমাকে কে ডেকেছে? তুমি তো এই সীনে ছিলে না!' বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ল্যাংফু। কোনও রকম আতঙ্কের আভাস পাওয়া গেল না ওর কণ্ঠে।

ম্যাটিতে পা রেখে বিছানার ধারে বসে আছে লোবো। তার সামনে রানার দিকে পেছন ফিরে একটা টুলের ওপর বসে রয়েছে মায়া। তার এক হাঁটু চেপে ধরে আছে লোবো মোটা দুই উরুর মধ্যে। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মায়া রানার দিকে। দুই চোখে অবিশ্বাস। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা। রানা দেখল পাঁচ আঙুলের দাগ লাল হয়ে আছে মায়ার বাম গালে।

একটা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিল ল্যাংফু। কনুইয়ের ওপর গাল রেখে উঁচু হলো সে, আরেকটা হাত আলগোছে চলে গিয়েছে শার্টের ভেতর শোল্ডার হোলস্টারে ভরা পিস্তলের বাঁটের কাছে। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল সে।

রানার পিস্তলটা দু'জনের ঠিক মাঝখানটায় ধরা। শান্ত নিচু গলায় রানা বলল, 'মায়া। বসে পড়ো মেঝের ওপর। হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের মাঝখানটায় সরে এসো। মাথাটা নিচু করে রেখো।'

তার কথামত কাজ করছে কিনা ফিরে দেখল না সে একবারও। লোবো আর ল্যাংফুর ওপর ছুটোছুটি করতে থাকল ওর সতর্ক দৃষ্টি।

সরে গেছে মায়া।

'এসেছি, রানা!' বলল সে। ওর কণ্ঠে আশা আর উত্তেজনার আভাস।

'এবার সোজা চলে যাও বাথরুমের মধ্যে। দরজা বন্ধ করে শাওয়ার খুলে দাও। যাও, জলদি!'

ক্লিক করে বাথরুমের দরজা বন্ধ হতেই নিশ্চিন্ত হলো রানা। বুলেট থেকে নিরাপদ তো থাকলই, দেখতেও হবে না ওকে এই আসন্ন লড়াই।

লোবো আর ল্যাংফু একে অপরের থেকে গজ দুয়েক দূরে আছে। যদি খুব দ্রুত একসাথে পিস্তল বের করতে পারে তাহলে যে-কোনও একজনের গুলিতে ওকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। দু'জনকে একসাথে এত দ্রুত শেষ করতে পারবে না রানা। একজনের ওপর গুলি করলেই আরেকজনের গুলি খেতে হবে তাকে। কিন্তু যতক্ষণ তার হাতের পিস্তলটা নীরব থাকছে ততক্ষণ এর ক্ষমতা অসীম।

হঠাৎ চীনা ভাষায় কি যেন বলে উঠল লোবো। অনেক রিহার্সেল দেয়া কোনও সঙ্কেত হবে। কথাটা বলেই মেঝের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। আর সেই সঙ্গে ডান হাতটা চলে গেল ওয়েস্ট-ব্যাগের কাছে।

বিছানার ওপর দ্রুত এক গড়ান দিয়ে সরে গেল ল্যাংফু যাতে মাথাটা ছাড়া রানা আর কোনও টার্গেট না পায়। এক ঝটকায় বেরিয়ে এল শার্টের তলা থেকে ওর পিস্তল ধরা হাতটা।

'দুপ!'

রানার পিস্তল মৃত্যু বর্ষণ করল। চাঁদিতে একটা ছোট্ট ফুটো তৈরি হলো ল্যাংফু-র।

'বুম' করে উত্তর দিল নিহত ল্যাংফু-র পিস্তল। বালিশের মধ্যে প্রবেশ করল তপ্ত সীসা।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোবো। মৃত্যু ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে ওর গলা। ভীত দুই চোখ মেলে দেখছে ও রানার পিস্তলটা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে। ওর রিভলভারটা এখনও রানার হাঁটুর নিচে ধরা। ওপরে ওঠাবার আর সুযোগ হবে না।

'ফেলে দাও ওটা।'

পড়ে গেল রিভলভারটা কার্পেটের ওপর।

'উঠে দাঁড়াও।'

হাঁসফাঁস করে উঠে দাঁড়াল মোটা। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রানার চোখে চোখে চেয়ে রয়েছে সে, ঠিক যেমন যক্ষ্মা রোগী তাকায় তার রক্তাক্ত রুমালের দিকে।

'এদিকে সরে এসে উবু হয়ে বসো মেঝের ওপর।'

ভীত চোখ দুটোতে কি একটু স্বস্তির আভাস ফুটে উঠল? সতর্ক থাকল রানা। খুব সাবধান থাকতে হবে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লোবো। রানা না বললেও মাথার ওপর হাত তুলে রাখল সে। দুই পা পিছিয়ে ফাঁকা জায়গায় এল সে। ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে। স্বাভাবিক ভাবেই হাত দুটো নামিয়ে আনল। স্বাভাবিক ভাবেই একটু দুলল হাত দুটো। বাম হাতের চাইতে ডান হাতটা একটু বেশি দুলল না? পর মুহূর্তেই ঝিক করে উঠল একটা থ্রোয়িং নাইফ।

'দুপ!'

চট্ করে একপাশে সরে গিয়েই গুলি করেছে রানা।

ডান চোখটা অদৃশ্য হয়ে গেল লোবোর। কালো বিকট একটা গর্ত সে জায়গায়। বাম চোখটা কপালে উঠল। প্রকাণ্ড ধড়টা আধপাক ঘুরে দড়াম করে পড়ল ড্রেসিং টেবিলের ওপর, সেটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে পড়ল মাটিতে।

সেদিকে চেয়ে দেখল রানা একবার। তারপর দাঁড়াল গিয়ে পোর্টহোলের সামনে। পর্দাটা সরিয়ে ঠাণ্ডা মুক্ত বাতাস গ্রহণ করল সে বুক ভরে। ওরা দু'জন আর কোনদিন এই বাতাসে শ্বাস নেবে না। তারা জ্বলা অপরূপ রাত্রিকে দেখল রানা দু'চোখ ভরে। ওরা কোনদিন দেখবে না। কান পেতে শুনল সে সমুদ্রের মিষ্টি কল্লোলধ্বনি। ওরা কোনদিন শুনবে না।

অথচ কত সুন্দর এই পৃথিবী!

ধীরে ধীরে দেহের উত্তেজিত স্নায়ুগুলো শান্ত স্বাভাবিক হয়ে এল রানার। সেফটি ক্যাচ তুলে দিয়ে কোমরে গুঁজল সে পিস্তলটা।

লোবোর বিছানার চাদরটা তুলে নিল একটানে। তারপর এসে দাঁড়াল বাথরুমের সামনে। কয়েকবার ডাকতেও কোনও সাড়া দিল না মায়া। দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলে দেখল রানা শাওয়ার খুলে দিয়ে দুই হাতে কান ঢেকে তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে মায়া ওয়াং চোখ বন্ধ করে।

শাওয়ার বন্ধ করে দিল রানা। কিন্তু তাও চোখ খুলল না মায়া। হয়তো মনে করল ট্যাঙ্কের পানি শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত কাপড়চোপড় চুপচুপে ভেজা। কানে হাত দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সে। হেসে ফেলল রানা। কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরাল সে মায়াকে। 'উহ্' করে এক চিৎকার দিয়ে ভয়ার্ত দুই চোখ মেলে চাইল মায়া। প্রথমে চিনতেই পারল না রানাকে। তারপর চিনতে পারল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল সে একবার। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকের ওপর।

'মায়া! এখানে দেরি করলে অসুবিধে হবে। এ ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে আমাদের। কিন্তু সর্বাঙ্গ যেভাবে ভিজিয়েছ তাতে তো তোমাকে নিয়ে—আচ্ছা, দাঁড়াও আমি চট করে বাইরেটা দেখে আসছি।'

'ওদের কি হলো? ওরা কোথায়?'

'ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। সব চুকে গেছে। আর কোনও ভয় নেই।'

দরজাটা খুলে মাথা বের করে এপাশ-ওপাশ দেখল রানা। কেউ নেই করিডরে। ঘড়িতে বাজছে সোয়া দশটা। মায়াকে নিয়ে এখন বেরোলে লোকের চোখে পড়বার সম্ভাবনা বিচার করে দেখল সে মনে মনে। স্থির করল রিস্কটা নিতে হবে।

ফিরে এসে দেখল জামা কাপড় নিঙড়ে যতটা সম্ভব পানি ঝরিয়ে ফেলেছে মায়া। টেবিলের ওপর থেকে একটা হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা। চাদরটা হালকা করে জড়িয়ে দিল মায়ার ভেজা কাপড়ের ওপর।

'চোখ বন্ধ করে রাখো। বাইরে না বেরোনো পর্যন্ত চেয়ো না কোন দিকে।'

মায়াকে একহাতে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। একহাতে খোলা মদের বোতল। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল সে। ক্লিক করে ছেদ পড়ল অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে।

মাতালের অভিনয় করবার কোনও প্রয়োজনই হলো না। জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখা গেল না সারাটা পথে। মায়ার কেবিনের সামনে এসে ছেড়ে দিল ওকে রানা।

'ভয় করছে!' কেবিনে ঢুকতে দ্বিধা করছে মায়া।

'স্বাভাবিক। তবে সত্যিই আর কোন ভয় নেই। এখানে একা তোমাকে থাকতেও হবে না। ভেজা কাপড় বদলে বেরিয়ে এসো, আমি দাঁড়াচ্ছি।'

কাপড় বদলে বেরিয়ে এল মায়া। ইতিমধ্যে হুইস্কির বোতলটা ছুঁড়ে দিয়েছে রানা রেলিঙের ওপারের অন্ধকারে।

'এবার?'

'চলো, দু'কাপ কফি খাই আগে। তারপর স্যুটকেস গুছিয়ে নিতে হবে। দু'ঘন্টার মধ্যে এ জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা।'

'কি ভাবে?'

'কফি খেতে খেতে বলব, চলো।'